ইউনিট
৫

ভূরূপ প্রক্রিয়া
Geomorphic Processes

পৃথিবীর স্থলভাগ এবং সমুদ্রের তলদেশের ভূপ্রকৃতি বৈচিত্রময়। সময়ের সাথে স্থলভাগ ও জলভাগের সকল ভূমিরূপের পরিবর্তন হচ্ছে। আজকের সমভূমি হয়ত অতীতে জলাভূমি, সাগরের অংশ বা পাহাড়-পর্বত ছিল। সে জন্যই হিমালয়, রকি ও আন্দিজ পর্বতমালার শৃঙ্গেও সামুদ্রিক জীব-জন্তুর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, এ সকল পর্বতের শিলা মাটি বিশ্লেষন করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে পর্বতগুলো সামুদ্রিক তলানি দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়ে গিরিজনি বা পর্বত গঠনকারী আলোড়নের (Orogenic movement) প্রভাবে পবর্তরূপে উত্থিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, পর্বত পাললিক শিলায় গঠিত।

ডেভিস ভূমিরূপ উদ্ভবের নিয়ন্ত্রক হিসেব তিনটি মৌলিক উপাদান চিহ্নিত করেছিল।

ওপরের আলোচনা থেকে লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের কারণ কি? ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেগুলো কি কি? ধীর গতিতে এবং আকস্মিকভাবে অথবা উভয় ভাবেই কি পরিবর্তন সংঘটিত হয়? পরিবর্তনের শক্তিসমূহ বা মাধ্যমসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহ কিভাবে কাজ করে? শক্তিসমূহের ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে কি কি ভূ-প্রাকৃতিক রূপের সৃষ্টি হয়, এ সবই এ ইউনিটের আলোচনার বিষয়।

ডেভিস ভৌগুলিক চক্রের ধারণা নদী ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, শুষ্ক

এ ইউনিটের আলোচ্য পাঠসমূহ-

পাঠ-৫.১: ভূ-রূপ প্রক্রিয়াসমূহ
পাঠ-৫.২: বিচূর্ণীভবন-যান্ত্রিক প্রক্রিয়া
পাঠ-৫.৩: বিচূর্ণীভবন-রাসায়নিক প্রক্রিয়া
পাঠ-৫.৪: বিচূর্ণীভবন-জৈবিক-প্রক্রিয়া
পাঠ-৫.৫: ভূমিরূপের ওপর বিচূর্ণীভবন ও স্তুপক্ষয়ের প্রভাব
পাঠ-৫.৬: নদী
পাঠ-৫.৭: নদীর কাজ
পাঠ-৫.৮: নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.৯: নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.১০: হিমবাহ
পাঠ-৫.১১: হিমবাহের প্রকারভেদ
পাঠ-৫.১২: হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.১৩: হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.১৪: হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয়
পাঠ-৫.১৫: বায়ু ও বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.১৬: বায়ুর কার্য
পাঠ-৫.১৭: বায়ুর ক্ষয় কার্যের ফল
পাঠ-৫.১৮: বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ-৫.১৯: মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ

পাঠ-৫.১

ভূ-রূপ প্রক্রিয়াসমূহ
Geomorphic Processes

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- ভূরূপ প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীন শক্তির প্রধান উৎস কি কি তা বলতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীন শক্তির প্রভাবে কি ধরনের পরিবর্তন হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্তনের সক্রিয় বাহ্যিক শক্তিসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন;
- এগুলো কি কি প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে তা বলতে পারবেন; এবং
- এগুলো দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের কি কি পরিবর্তন হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৫০ সালের পরে ভূমিরূপ বিদ্যায় সমীক্ষার পদ্ধতি ও ধরনের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভূপৃষ্ঠ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যে সমস্ত ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপে সদা পরিবর্তন হয়ে তাদের ভূরূপ প্রক্রিয়া বলে। ভূমিরূপ প্রক্রিয়াকে প্রধান দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। বহিস্থ ভূপৃষ্ঠের এই পরিবর্তন (ক) আকস্মিক (Sudden) ও (খ) ধীর (Slow) এই দুইভাবে ঘটে থাকে। যেমনঃ আলোড়ন, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি শক্তিগুলো ভূপৃষ্ঠ ও অভ্যন্তর ভাগে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায়। আবার তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষার ইত্যাদি বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিও মানব সৃষ্ট কারণে ভূপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যেমন : শিলাতে ফাটল, কঙ্কল মোচন ইত্যাদি। প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ভূমিরূপের এই পরিবর্তন ভূপৃষ্ঠে ও এর অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়ে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এইরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাদের দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ (i) বহিঃস্থ ভূরূপ প্রক্রিয়া (Exogenetic Procss) : ও অন্তঃস্থ ভূরূপ প্রক্রিয়া (Endogenetic Procese) : বহিঃস্থ ভূরূপ প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের উপর পরিবর্তনকারী শক্তি ক্রিয়া করে ও অন্তঃস্থ প্রক্রিয়ায় শক্তির উদ্ভব ঘটে ভূ-অভ্যন্তরে।

ভূরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যম হলো, যে কোনো প্রাকৃতিক শক্তি, যার দ্বারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক নানা উপাদানকে স্থানান্তর করতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নদী, ভূগর্ভস্থ পানি, ঢেউ, স্রোত, জোয়ার-ভাটা, বায়ু, হিমবাহ প্রভৃতি ভূরূপ গঠনের মাধ্যম (agent)।

পৃকৃতপক্ষে ভূমিরূপ পদ্ধতি একটি আন্তঃপ্রক্রিয়ার গাঠনিক রূপ যার কার্যকারিতা স্বতন্ত্রভাবে ও যৌথভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে ্কটি যৌগক ভূমিরূপ গঠন করে।

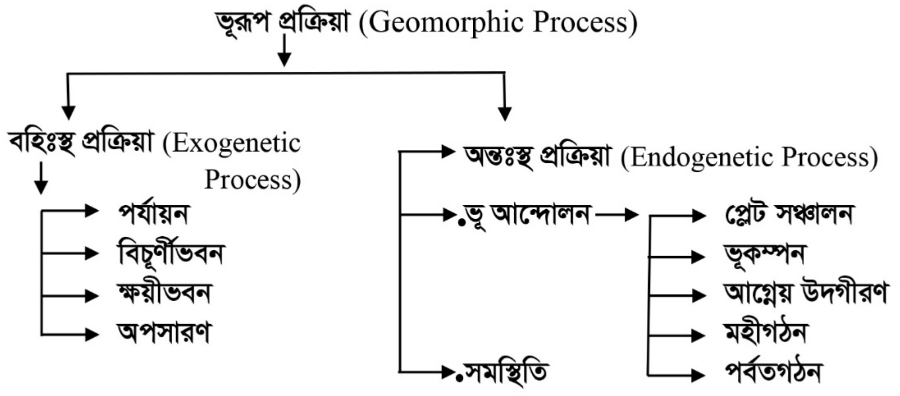

চিত্র : ৫.১.১ : ভূমিরূপ প্রক্রিয়া (কাজী, পৃ.: ১২০)

বহিস্থ ভূরূপ প্রক্রিয়াকে তিনটি স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) অবনমন (Denudation), (খ) সঞ্চয়ন বা অবক্ষেপন (Depositional) ও (গ) জৈব প্রক্রিয়া (Biological Process)

প্রথম দুটো প্রক্রিয়াকে এক সাথে পর্যায়ন প্রক্রিয়া (Gradational Process) বলে। এবনমন বা প্রক্রিয়া (Degradation) বলতে সাধারণত সেই সব প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা কমায়। একে নগ্নীভবন প্রক্রিয়াও বলা হয়। সঞ্চায়ন বা অবক্ষেপন প্রক্রিয়া (aggradation) বলতে সেই সমস্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা অবক্ষেপন ক্রিয়ার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ায়।

ক) অবনমন প্রক্রিয়া বা নগ্নীভবন প্রক্রিয়া (Denudation Process) :

অবনমন প্রক্রিয়া তিন ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা : (i) বিচূর্ণীভবন (Wathering), (ii) ক্ষয়ীভবন (Erosion) এবং (iii) অপসারণ (Transportation). বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় স্বস্থানে থেকে শিলার খন্ড-বিখন্ড হওয়াকে বিচূর্ণীভবন বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র শিলা খন্ডিত হয়; অপসারিত হয় না। বিচূর্ণীত শিলার অপসারণ ঘটলে তাকে ক্ষয়ী ভবনের অন্তর্গত করা হয়। বিচূর্ণীভবন ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এটা ভূ-পৃষ্ঠের আলগা শিলা খন্ডের সৃষ্টি করে। এতে ক্ষয়কার্যের সুবিধা হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে ক্ষয়িত শিলাখন্ড পানি বা বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারিত হয় এভাবে ভূমির ঢাল বেয়ে যখন অনেক পরিমাণে ক্ষয়িত পদার্থের ব্যাপক অপসারণ হয়, তখন তাকে (Bulk Transfer) স্তূপ ক্ষয় বলে বা অপসারণ (Transportation) অপসারণের ক্ষেত্রে একটি গতিশীল মাধ্যম থাকে যা প্রবাহ পথের ওপর বা তার বাইরের নূড়ি পাথর (Debris) সংগ্রহ,পরিবহন ও স্থানান্তরিত করে। সমুদ্র তরঙ্গ ঢেউ, স্রোত, জোয়ার-ভাটা, নদীর পানি, হিমবাহের এবং বায়ুপ্রবাহ ডেবরিস অপসারণ করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পরিবহন প্রক্রিয়ায় পরিবহন মাধ্যমের পরিমাণের তুলনায় পরিবাহিত পদার্থের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে কম থাকে।

পরিবহন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমগুলো কিভাবে পরিবহন করে তা সবক্ষেত্রে এক রকম হয় না। তবে যে ভাবেই হোক পরিবহন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে:

১. বিচ্ছিন্ন শিলা রাশি (Debris) সংগ্রহ,
২. বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবাহ পথের ওপর শিলার ভাঙ্গন ও তা সংগ্রহ এবং
৩. উপরোক্ত দুই উপায়ে অপসারণের মাধ্যম বিচ্ছিন্ন শিলারাশি সংগ্রহ করে এবং তার অপসারণ ঘটায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিচূর্ণীত হবার পর ভাঙ্গা শিলা অপসারণ নাও হতে পারে। আবার বিচূর্ণীভূত না হয়ে, ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কারী মাধ্যম নিজেই শিলা ভেঙ্গে ও তার অপসারণ ঘটিয়ে নগ্নীভবন ঘটাতে পারে। অবনমন বা নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ, অর্থাৎ বিচূর্ণভবন, ক্ষয়ীভবন ও অপসারণ ভূমিরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

খ) সঞ্চায়ন বা প্রক্রিয়া অবক্ষেপন (Depositional Process) :

ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ বিভিন্নভাবে বাহিত ও অপসারিত হয়ে এক সময় কোনো এক স্থানে জমা হয়। কাজেই সঞ্চয় ক্ষয়ের পরিপূরক। ক্ষয় ও সঞ্চয় একসাথে কাজ করে ভূ-পৃষ্ঠের সমতলীকরণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। প্লাবন ভূমিতে নদীর পলল সঞ্চয়, ব-দ্বীপ গঠন, হিমবাহ সঞ্চিত গ্রাবরেখা, সমুদ্র সঞ্চিত পলি, বায়ু সঞ্চিত বালি, ভূগর্ভে সঞ্চিত স্ট্যালাকটাইট, স্ট্যালাগমাইট প্রভৃতি সঞ্চয় কাজের কয়েকটি উদাহরণ।

পাঠসংক্ষেপ :

যে সকল ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠের রূপকে পরিবর্তন করে তাদেরকে ভূমিরূপ প্রক্রিয়া বলে। ভূমিরূপ প্রক্রিয়াকে প্রধান দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-বহিস্থ ভূমিরূপ প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের বাইরের পরিবর্তনকারী শক্তি কাজ করে ও অন্তঃজ প্রক্রিয়ায় শক্তির উদ্ভব ঘটে ভূ-অভ্যন্তরে। সামগ্রিক ভাবে অন্তঃজ প্রক্রিয়ার কাজ গঠনমূলক ও বহিজ প্রক্রিয়ার কাজ বিনাশমূলক। বহিজ প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ধীরে ধীরে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধন করে। অন্তঃজ প্রক্রিয়া ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। ভূ-অভ্যন্তরের প্রবল শক্তি ভূ-ত্বকের ধীরে ও আকস্মিক উভয় প্রকার পরিবর্তন সাধন করে। আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের হঠাৎ যে পরিবর্তন সাধন করে তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে। বহির্বিশ্ব থেকে আগত উল্কাপাতের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনকেই অপার্থিব প্রক্রিয়া বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১.১ পৃথিবী পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের সঙ্গে কোন প্রক্রিয়া জড়িত?
(ক) অন্তঃজ প্রক্রিয়া (খ) বহিজ প্রক্রিয়া
(গ) অপার্থিব প্রক্রিয়া (গ) কোনটিই নয়

১.২. ক্ষয়ীভবন বলতে বোঝায়-
(ক) ভূমির উচ্চতা হ্রাস পাওয়া (খ) উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া
(খ) উচ্চতা অপরিবর্তিত থাকা (গ) কোনটিই নয়

১.৩. ভূ-আলোড়নের সঙ্গে কোনটির সম্পর্ক নেই?
(ক) আগ্নেয়গিরি (খ) ভূমিকম্প
(গ) জলপ্রপাত (ঘ) পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংকোচন

২. শূণ্যস্থান পূরন করুন :

২.১. বহিজ ভূরূপ প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের বাইরের .... করে ও অন্তঃজ প্রক্রিয়ায় শক্তির .... ঘটে ভূ-অভ্যন্তরে।

২.২. আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে .... ভাগে ভাগ করা যায়।

২.৩. সরাসরি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ভূমির ঢাল বেয়ে এক সঙ্গে পদার্থের ব্যাপক অপসারণকে .... বলে।

২.৪. সঞ্চয় .... পরিপুরক

২.৫. ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাচূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে .... ও অপসারিত হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ভূমিরূপ প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

২. নগ্নীভবন, ক্ষয়ীভবন ও অবক্ষেপন এর সংজ্ঞা দিন। নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ভূমিরূপ পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫.২

বিচূর্ণীভবন-যান্ত্রিক প্রক্রিয়া
Weathering-Physical Process

এই অংশটি পাঠ করে আপনি–

- বিচূর্ণীভবন কি তা বলতে পারবেন;
- বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের পার্থক্য জানতে পারবেন;
- আবহাওয়ার কি কি উপাদান শিলার বিচূর্ণীভবন ঘটায় সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন;
- বিচূর্ণীভবন কি কি কাজ সম্পাদন করে তা জানতে পারবেন; এবং
- যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন কি কি প্রক্রিয়ার দ্বারা কিভাবে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে ধারনা পাবেন।

বিচূর্ণীভবন (Weathering) :

বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবনের তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়া। তাই বিচূর্ণীভবন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নগ্নীভবন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তি ভূত্বকে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গড়ে তোলে। অপরদিকে নগ্নীভবন এ সমস্ত ভূমিরূপকে ক্ষয় করে সমুদ্র সমতলেই নিয়ে আসার কাজে লিপ্ত থাকে এবং ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা কমায়। তাই, সাধারণভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা অন্যত্র অপসারিত হয় তাই নগ্নীভবন।

বিচূর্ণভবন, নগ্নীভবনের একটি অংশ। নগ্নীভবন চার ধরনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। যথা- ক) বিচূর্ণীভবন, খ) স্তুপ অপসারণ, গ) ক্ষয়সাধন এবং ঘ) পরবহণ

(১) নগ্নীভবন, (২) ক্ষয়ীভবন ও
(৩) অপসারণ (৪) ক্ষয়সাধন

নগ্নীভবনের যে চারটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে বিচূর্ণীভবন শিলার ক্ষয়সাধন প্রক্রিয়ার তিনটি প্রথম পর্যায় হিসেবে কাজ করে।

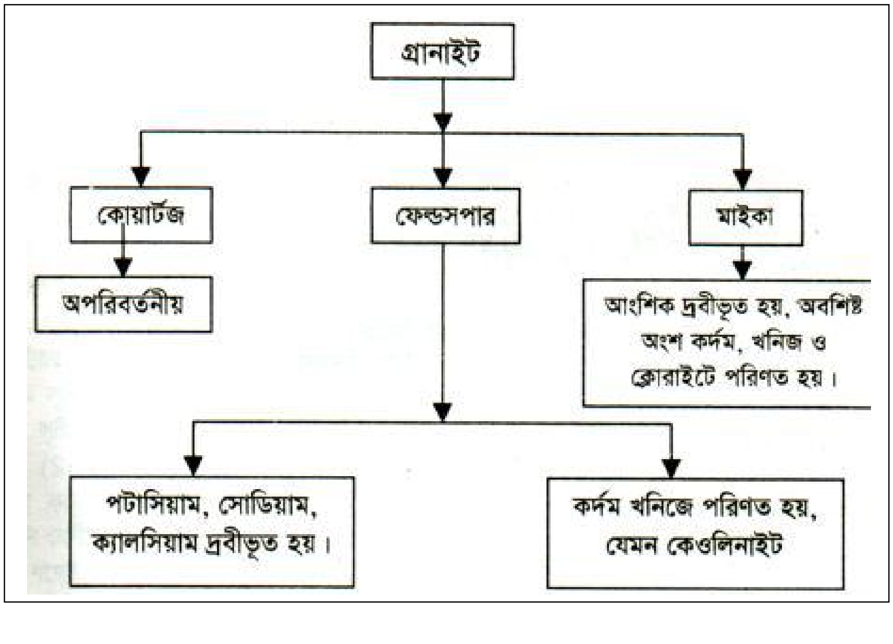

চিত্র : ৫.২.১ : নগ্নীভবন প্রক্রিয়া

বিচূর্ণীভবন (Weathering) :

বিচূর্ণীভবন কথার অর্থ শিলা চুর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া।

বিচূর্ণীভবন কথার অর্থ শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। বিচূর্ণীভবন ভূ-পৃষ্ঠের নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের শিলা প্রাকৃতিকভাবে ছোট ছোট খন্ডে ভাগ হয় অথবা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় অথবা রাসায়নিকভাবে দ্রবীভূত হয় তাকে বিচূর্ণীভবন বলে। বিচূর্ণীভবনকে আবহিক বিকার বলা হয় কারণ আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান বিশেষ করে উত্তাপ, আর্দ্রতা, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির তারতম্য ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। সুতরাং আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান দ্বারা যান্ত্রিক উপায়ে শিলাস্তর ফেটে (Mechanical Fracturing) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখন্ডে পরিনত হয়ে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলাস্তর বিয়োজিত হয়ে (Chemical Decomposition) মূল শিলার উপরই যদি থেকে যায়, তখন তাকে বিচূর্ণীভবন (Weathering) বলা হয়। এই সকল শিলা খন্ডের অপসারণকে ক্ষয়ীভবন (Erosion) বলে।

বিচূর্ণীভবন পাক্রিয়া তিন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা- প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈনিক। চারটি কাজ করে থাকে। যেমন (১) শিলার ক্ষয়সাধন (২) ভূমির উচ্চতা হ্রাস (৩) ভূমিরূপের পরিবর্তন ও (৪) রেগোলিথ ও মাটি গঠনে ভূমিকা।

সুতরাং বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ক্ষয়ীভবন শিথিল শিলাখন্ডসমূহ দূর দেশে অপসারিত (Transported) হয়। কিন্তু বিচূর্ণীভবনে মাধ্যকর্ষণ শক্তির দ্বারা শিলাখন্ড সামান্য স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু শিলাখন্ডের অপসারণ হয় না। নগ্নীভবন প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীভবনের অবস্থান নিচে দেখানো হলো :

ছক ৫.২.১ থেকে লক্ষ্য করুন, বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া তিন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা-যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক। বিচূর্ণীভবনের এ প্রক্রিয়া যে ভাবেই সম্পন্ন হোক না কেন নিম্নোক্ত চারটি কাজ এর দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে :

ক) শিলা/মাটির ক্ষয়সাধনে কাজ করে;
খ) ভূমির উচ্চতা কমাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে;
গ) ভূমিরূপের পরিবর্তনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে; এবং
ঘ) রেগোলিথ ও মাটি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

বিচূর্ণীভবনের শ্রেণীবিভাগ :

ভূপেষ্ঠের কঠিন শিলা আবরণ যে প্রাকৃতিক প্রকিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় তাই প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন

১। যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন (Mechanical or Physical Weathering) যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ উত্তাপের তারতম্যে, তুষার কার্য এবং আংশিকভাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর ক্রিয়াকলাপে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

২। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical Weathering) : যেখানে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত পানি, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং জৈব পদার্থ ও এগুলোর অবশিষ্ঠাংশের দ্বারা শিলার খনিজ দ্রব্যসমূহ বিয়োজিত ও দ্রবীভূত হয়ে আলগা হয়ে পড়ে।

৩। জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological Weathering) : জীবজন্তু ও বিভিন্ন জৈব পর্যায়ের দ্বারা সংঘটিত বিচূর্ণীভবনকে অনেক সময় জৈবিক বিচূর্ণীভবন নামে অভিহিত করা হয়। জৈবিক বিচূর্ণীভবন যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাজ করে থাকে।

বিচূর্ণীভবনকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা হলেও একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে সামান্যতম জলীয়বাষ্পের অবস্থান, রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনকে পৃথিবীর সর্বত্র কাজ করতে সাহায্য করে থাকে। তবে সুবিধার জন্য আমরা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনকে পৃথিবীর সর্বত্র কাজ করতে সাহায্য করে থাকে। তবে সুবিধার জন্য আমরা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এ দুই প্রকার বিচূর্ণীভবন একত্রেই কাজ করে থাকে।

যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন (Mechanical or Physical Weathering) :

যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তনে এবং কেলাসন প্রক্রিয়ার (Crystallisation) দ্বারা ঘটে থাকে। মরু অঞ্চলে মেঘ মুক্ত থাকার দরুন দিবা ভাগ খুবই উত্তপ্ত এবং রাত্রি ঐ একই কারণে খুব শীতল হয়ে থাকে। ফলে মরু অঞ্চলে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অথবা উচ্চ অক্ষাংশে অধিক শৈত্যের জন্য পানি কেলাসিত হয়ে বরফে পরিণত হয়। সুতরাং মরু অঞ্চল এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চ অক্ষাংশে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলা আবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় তাই প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলাখন্ডের আয়তন বড় পাথর থেকে পলিকণা পর্যন্ত বিভিন্ন রকম হতে পারে।

১। **তাপমাত্রা পরিবর্তনের মাধ্যমে :**

সূর্যতাপের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি খন্ডবিখন্ড হয়ে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। মরুভূমি এলাকায় দিনের প্রচন্ড সূর্যতাপে শিলার খনিজসমূহ আয়তনে বাড়ে, ঠান্ডায় তা সঙ্কুচিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে খনিজসমূহ শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শিলা স্তরের উপরেই স্বাভাবিকভাবে সূর্যরশ্মি পতিত হয় তখন শিলা উত্তপ্ত হয়ে পার্শ্ব বা নিচের দিকে প্রসারিত হতে না পেরে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। এর ফলে শিলার উপরের স্তর নিচের শীতল স্তর থেকে পৃথক হয়ে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা অনেকটা পেঁয়াজের খোসার ন্যায় খুলে যায়। শিলার এরূপ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে শিলার স্তর মোচন (Exfoliation) বলা হয়। এভাবে শিলার উপরের অংশ আলগা হয়ে খন্ড-বিখন্ড হতে থাকে এবং কালক্রমে গোলাকার রূপ ধারণ করে। এ জাতীয় বিচূর্ণীভবনকে গোলাকৃতি বিচূর্ণীভবনও (Spheroidal Weathering) বলা হয়। এভাবে সৃষ্ট গোলাকার শিলাখন্ডকে অবশিষ্ট শিলা (Residual Boulder) বলে। এটি গ্রানাইট শিলায় অধিক দৃষ্ট হয়।

যেহেতু শিলাসমূহ বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত, সেহেতু শিলায় অবস্থিত বিভিন্ন খনিজ বিভিন্ন ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। এর ফলে শিলায় বিভিন্ন টান (Strain) সৃষ্টি হয়ে শিলা হঠাৎ ফেটে যায়। মরু-অঞ্চলে সূর্যাস্তের কিছু পরে অনেক সময় এরূপ শিলা ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এভাবে শিলা বিভিন্ন খনিজের মধ্যস্থিত সংযোগ সাধক পদার্থের (Cementing Material) মধ্য দিয়ে ফাটল তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় বলে একে কণা বিশরণ (Granular Disintegration) বলে। সূর্যতাপে শিলার উপরের স্তর উত্তপ্ত হলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শিলাস্তর তাপের উত্তম পরিবাহী নয় বলে তার ঠিক নিচের স্তরটি বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। এর ফলে শিলাসমূহের উপরের স্তর এবং তার ঠিক নিচের স্তরের মধ্যে টানের সৃষ্টি হয় বলে শিলাস্তরের মাঝে সমান্তরালে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এর কিছু দিন পরে ঐ ফাটল বরাবর শিলার উপরের স্তরটি মূল শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরূপ অবস্থাকে প্রস্তর চাঁই-এর বিচ্ছিন্নকরণ বা খন্ডীকরণ বা খন্ডীকরণ (Block Disintegration) বলা হয়। পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে এ প্রকার বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

২। **তুষারের মাধ্যমে :**

অধিকাংশ শিলায় ফাটল ও জোড়ন (Cracks and Joints) দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ফাটল বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে থাকে। রাত্রিতে পানি শীতল হয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তনে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শীতল জলবায়ু অঞ্চলে অথবা উচ্চ অক্ষাংশে বা উচ্চ পর্বত গাত্রে গ্রীষ্মকালে বরফ গলে অথবা বর্ষাকালে শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে পানি সঞ্চিত হলে তা পরে অত্যধিক ঠান্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়। তার ফলে ফাটলের মধ্যস্থিত পানি বরফে পরিণত হয়। ফাটলের দুই পার্শ্বের দেয়ালে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয় (প্রতি বর্গ সে.মি. প্রায় ১৪ কিলোগ্রাম)। এই চাপের ফলে ফাটল ক্রমশ : বৃদ্ধি পায় এবং শিলাস্তর ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডে পরিণত হয়। এই প্রস্তর খন্ডগুলো পর্বতগাত্র বেয়ে পর্বতের পাদদেশে এসে জমে। এরূপ কোনো বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার শিলাখন্ডের দ্বারা আবৃত

অঞ্চলকে ফেলসেনমার বা ব্লকস্পেড (Felsenmer বা Blockspad) বলে। পর্বত গাত্রে কোণাকৃতি এরূপ প্রস্তর খন্ড সঞ্চিত হলে তাকে স্ক্রী (Screes) বা ট্যালাস (Tallus) বলে। সচ্ছিদ্র (Porous) মৃত্তিকার মধ্যেও পানি বরফে পরিণত হলে মৃত্তিকা ফেটে যায়। শীত প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রের বড় বড় মাটির ঢেলা (Colds of Earth) তুষারের ক্রিয়ায় ফেটে যায়। এতে পরবর্তী কৃষিকার্যের সুবিধা হয়।

৩। পানির মাধ্যমে :

পানি তিন প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীভবন করে থাকে। যেমন, (ক) বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি বছরের পর বছর ধরে শিলা খন্ডগুলোকে আঘাত করে দুর্বল করে ফেলে এবং এতে শিলাখন্ডগুলো ক্রমশ : খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। (খ) কখনো কখনো পানি নরম পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং শিলাস্তরকে আর্দ্র করে ফেলে। পরে সূর্যের তাপে ঐ পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং শিলা খন্ডগুলো পুনরায় শুকিয়ে যায়। শিলাস্তরের অভ্যন্তর ভাগ এরূপে ক্রমাগত আর্দ্র ও শুষ্ক হবার দরুন তা ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলা খন্ডে পরিণত হয় এবং যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়। (গ) আবার শিলাস্তরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে শিলাস্তরকে আর্দ্র করে। এতে শিলার মধ্যস্থিত খনিজ দ্রব্যগুলো আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে শিলাস্তরকে ফাটিয়ে দেয়। এভাবেও যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটে। উপকূল অঞ্চলে জোয়ার–ভাটার প্রভাবে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪। চাপহ্রাসের মাধ্যমে :

ভূ–অভ্যন্তরে সৃষ্ট আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা ওপরের পাললিক শিলা স্তরের চাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ওপরের শিলাস্তর অপসারিত হলে ভূ-অভ্যন্তরের শিলার উপর চাপহ্রাস পায়। ফলে এ সমস্ত শিলা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় শিলার ওপরের স্তর নিচের মূল শিলা থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এ ধরণের বিচুর্ণীভবন দেখা যায়।

৫। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে :

উচ্চ পর্বত গাত্রের খাড়া ঢালে কোনো প্রকান্ড শিলাখন্ড কোনো প্রকারে ভেঙ্গে আলগা হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। পতিত শিলার আঘাতে পাদদেশের শিলাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আবার চলার পথে ভূ-পতিত শিলা অন্যান্য উচ্চ স্থানের শিলাগুলো সদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এভাবে সর্বদা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটাচ্ছে।

৬। লবন কেলাস গঠনের মাধ্যমে :

শিলার ফাটলে বরফ কেলাস গঠনের ন্যায় লবন কেলাস সৃষ্টিও একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শুষ্ক এলাকায় ব্যাপক ভাবে শিলা বিচূর্ণীভূত হয়। দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে শিলার ফাটল বরাবর ভেতরের পানি কৈশিক শক্তির (Capillary Force) টানে উপরে উঠে আসে। এ পানির সঙ্গে লবন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানি বাষ্পীভূত হওয়ার পর শিলার ফাটলে অবশিষ্ট হিসেবে এ লবন থেকে যায়। ধীরে ধীরে এ লবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিলার বর্হিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাকৃতিতে ভেঙ্গে যায়। আমাদের দেশে ইটের দালানে এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়, যা সাধারণভাবে ‘লোনাধরা’ নামে পরিচিত।

বৃষ্টিপাত দ্বারা সৃষ্ট বিচূর্ণীভুত পদার্থগুলো অপসারিত হলে তা বিচূর্ণীভবনের পর্যায় পড়ে না। তবে এটি তুষারের কার্যে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া বায়ু, নদী, হিমবাহ, সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভৃতির শিলা অপসারণ হয় বলে এদের কার্যও বিচূর্ণীভবনের পর্যায়ে পড়ে না।

পাঠসংক্ষেপ :

বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবনের একটি অংশ। নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তি ভূত্বকে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গড়ে তোলে। নগ্নীভবন ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা কমায়। নগ্নীভবন চার ধরনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। যেমন, (১) বিচূর্ণীভবন, (২) স্তুপ অপসারণ, (৩) ক্ষয়সাধন ও (৪) পরিবহন। এই চারটির মধ্যে বিচূর্ণীভবন শিলার ক্ষয়সাধনে না হওয়া। বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া তিন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন- (১) প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক, (২) রাসায়নিক ও (৩) জৈবিক প্রক্রিয়ায়। বিচূর্ণীভবন চারটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। যথা-(ক) শিলার ক্ষয়সাধন, (খ) ভূমির উচ্চতাহ্রাস, (গ) ভূমিরূপের পরিবর্তনও (ঘ) রেগোলিথ ও মাটি গঠনের ভূমিকা।
ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলাবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় তাকে প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে তাপমাত্রা, তুষার, পানি, চাপেরহ্রাস, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও লবন কেলাস গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। **শূণ্যস্থান রূরন করুন:**
১.১. বিচূর্ণীভবন ....একটি অংশ।
১.২. নগ্নীভবন ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা .... করে।
১.৩. নগ্নীভবন .... ধরনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে।
১.৪. বিচূর্ণীভূত শিলাখন্ডের .... কে ক্ষয়ীভবন বলে।
১.৬. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া .... ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
১.৭. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া .... কাজ সম্পাদন করে থাকে।
১.৮. মরু অঞ্চল, উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চ অক্ষাংশে .... বিচূর্ণীভবনের ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়।
১.৯. শিলা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হওয়াকে ...... বিচূর্ণীভবন বলে।
১.১০.......... এলাকায় দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য সর্বাধিক।
১.১১. শিলা বিভিন্ন .... সমন্বয়ে গঠিত।
১.১২. বিভিন্ন খনিজ বিভিন্ন ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয় বলে শিলায় বিভিন্ন .....সৃষ্টি হয়ে শিলা হঠাৎ ফেটে যায়।
১.১৩. পানি শীতল হয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তনে শতকরা ....ভাগ বৃদ্ধি পায়।
১.১৪. পর্বত গাত্রে শিলাখন্ড ভেঙ্গে ....শক্তির প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।
১.১৫. বৃষ্টিপাতে বিচূর্ণীভবন পদার্থ অপসারিত হলে তা .... পর্যায়ে পড়ে না।
১.১৬. দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে শিলার ফাটল বরাবর ভেতরের পানি ...... শক্তির টানে উপরে উঠে আসে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :
১. বিচূর্ণীভবন বলতে কি বোঝেন?
২. বিচূর্ণীভবনকে কেন আব হীবকার বলা হয়?
৩. বিচূর্ণীভবন যে চারটি কাজ করে সেগুলো কি কি?
৪. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন, রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন ও জৈবিক বিচূর্ণীভবনের মধ্যে পার্থক্য কি?
৫. ক্ষয়ীভবন ও বিচূর্ণীভবনের মধ্যে পার্থক্য কি?
৬. নগ্নীভবন অর্থ কি?
৭. নগ্নীভবন কি কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে।
৮. টেলাস স্ক্রী বলতে কি বোঝায়?
৯. এক্সফলিয়েশন কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন :
১. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের মধ্যে পার্থক্য কি? যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ-৫.৩

বিচূর্ণীভবন : রাসায়নিক প্রক্রিয়া
Weathering : Chemical Process

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন কি;
- রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের ফলে কি ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে সে সম্পর্কে; এবং
- রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

শিলা বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এই সকল খনিজগুলোর উপর বাহুমন্ডলের উপাদানগুলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিশেষত: অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বিক্রিয়া করে থাকে।

শিলা বিভিন্ন খনিজের (Minerals) সমন্বয়ে গঠিত। এই সকল খনিজ দৃঢ়করণ পদার্থের (Cementing Material) দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন শিলায় বিভিন্ন প্রকারের খনিজ দেখতে পাওয়া যায়। এই খনিজগুলোর ওপর বায়ুমন্ডলের প্রধান উপাদানগুলো, বিশেষত: অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বিক্রিয়া (Reaction) করে থাকে। এর ফলে কঠিন শিলা বিয়োজিত (Decomposed) হয় এবং মূল খনিজগুলো নতুন গৌণ খনিজে (Secondary Mineral) পরিণত হয়ে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে।

আর্দ্র অঞ্চলে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধান। এমনকি শুষ্ক অঞ্চলেও এটা সত্য হতে পারে। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় :

ক) শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায় ও শিলার মধ্যে নানা রকম পীড়নের উদ্ভব হয়।
খ) অপেক্ষাকৃত ভারী খনিজ হালকা খনিজে পরিণত হয়।
গ) পরিবর্তিত খনিজগুলোর আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ফলে এর পৃষ্ঠদেশের আয়তন বৃদ্ধি পায়।
ঘ) অধিকতর পরিবহনযোগ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়।
ঙ) অধিকতর সুস্থিত পদার্থের উদ্ভব হয়।
চ) খনিজের গঠন কাঠামোর পরিবর্তন হয়।

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধানত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যথা-(ক) হাইড্রোজেন বা জলযোজন (২) হাইড্রোলিসিস (৩) অক্সিডেশন (৪) কার্বোনেশান বা অঙ্গারযোজন ও (৫) দ্রবণ।

এদের মধ্যে খনিজের পৃষ্ঠদেশের আয়তন বৃদ্ধি শিলার ভাঙ্গনে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। কারণ পৃষ্ঠদেশের বর্ধিত আয়তন চার পাশের তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কার্যকারিতাকে বাড়ায়। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধানত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যথা- (ক) যোজন পানি (Hydration), পানি বিয়োজন (hydrolysts) (২) হাইড্রোলিসিস (Hydrolysis), (৩) জারন (Oxidation), (৪) অঙ্গারন (Carbonation) ও (৫) দ্রবণ (Solution)।

ক) পানি যোজন (Hydration) : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে খনিজের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে পানি যোজন বলা হয়। খনিজ বাতাস হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে স্ফীত ও প্রসারিত হয়, যার ফলে শিলার মধ্যে পীড়নের (Strain) সৃষ্টি হয়। এ্যানহাইড্রাইট (Anhydrite) এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জিপসাম (Gypsum) -এ পরিণত হয়ে থাকে।

যথা : $CaSO_4 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4.2H_2O$
(এ্যানহাইড্রাইট) + (পানি) → (জিপসাম)
$CaSO_4 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4.2H_2O$
(এ্যানহাইড্রাইট) + (পানি) → (জিপসাম)

হেমাটাইট ও এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লিমোনাইটে পরিণত হয়। যথা :

$2Fe_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 . 3H_2O$
(হেমাটাইট) + (পানি) → (লিমোনাইট)

$2Fe_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 . 3H_2O$
(হেমাটাইট) + (পানি) → (লিমোনাইট)

হাইড্রেশান প্রক্রিয়াকে যথার্থ রাসায়নিক পরিবর্তন বলা যায় না। হাইড্রলিসিস, কার্বনেশান, অক্সিডেশান হলো যথার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়া কারণ এইসব প্রক্রিয়ায় খনিজের বিয়োজন ঘটে।

খ) পানি বিয়োজন (Hydrolysis) :

এ প্রক্রিয়ায় পানি (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+ions) এবং হাইড্রক্সিল (OH^-+ions) আয়নে ভেঙ্গে যায় এবং হাইড্রেক্সিল (OH) খনিজের মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটায়। সাধারণত আর্দ্রতার বিভিন্নতার কারণে ফেলস্পার ও বায়োটাইটের ওপর এ প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী হয়। ফেলস্পারের ওপর হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ার ফল নিম্নলিখিত সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায় :

পানি (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) হাইড্রক্সিল (OH^-+) আয়নে ভেঙ্গে যায় এবং হাইড্রেক্সিল (OH) খনিজের মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটায়। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোলিসিস বলে।

(১) $KAlSi_3O_8 + HOH \rightarrow HAlSi_3O_8 + KOH$
(অর্থোক্লেজ) + (হাইড্রক্সিল) → (এ্যালুমিনো-সিলিসিক এসিড) (পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড)
(2) $2KOH + H_2CO_3 \rightarrow K_2CO_3 + 2HOH$
(পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড)+(কার্বন এসিড) →(পটাসিয়াম কার্বনেট)

গ) জারন (Oxidation) :

খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে অক্সিডেশান বলে। অক্সিজেন ও পানি, কার্বনিক এসিডের ন্যায় বিভিন্ন খনিজের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু যে সকল শিলায় সালফাইড, কার্বনেট এবং সিলিকেটরূপে লৌহ অবস্থান করছে, সেই সকল শিলার লৌহের সঙ্গে এটি অতি সহজেই বিক্রিয়া করে থাকে। এজন্য শিলার যে অংশে লৌহের পরিমাণ অধিক, সে অংশে লৌহের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হওয়ায় লৌহের উপরি ভাগের রং হলুদ বা বাদামী হয়। লৌহ যখন 'ফেরাস অক্সাইড' রূপে থাকে তখন এটি খুব কঠিন হয়। কিন্তু অক্সিডেশানের ফলে এটি ফেরিক অক্সাইডে' পরিণত হয় এবং সহজেই ভেঙ্গে যায়। এ কারণে দেখা যায় যে, লৌহ নির্মিত দ্রব্য মরিচা ধরে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ বাতাসের অক্সিজেন লৌহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হলুদ বা বাদামী রং এর 'লিমোনাইট' ($Fe_2O_3 . 2H_2O$) গঠন করে এবং তা সহজেই ভেঙ্গে যায়। এ্যামইফবোল এভং পাইরিক্সন এ প্রক্রিয়ার দ্বারা সহজেই পরিবর্তিত হয়।

খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে অক্সিডেশান বলে।

নিম্নে অলিভিন-এর অক্সিডেশান সমীকরণের সাহায্যে দেখানো হলো :

$MgFeSiO_4 + 2HOH \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2SiO_3 + FeO$
(অলিভিন)+(হাইড্রোক্সিল)→(ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সিল)+(সিলিসিক এসিড)+(ফেরাস অক্সাইড)
ফেরাস লৌহ নিম্নলিখিতভাবে বিক্রিয়া করে লিমোনাইটে রূপান্তরিত হয়। যথা-

$4FeO + 2H_2O \rightarrow 2Fe_2O + O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 . 3H_2O$
(ফেরাস অক্সাইড)+(পানি)→(লিমোনাইট)

ঘ। অঙ্গারন (Carbonation) : বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোজনকে কার্বনেশান বলে। বৃষ্টির পানি বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হবার সময় বায়ুমন্ডলস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মৃদু এসিডে পরিণত হয়।

$H_2O + CO_2 = H_2CO_2$ (কার্বনিক এসিড)
(পানি + কার্বন-ডাই-অক্সাইড = কার্বনিক এসিড)

অনেক সময় পচা জৈব পদার্থের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও তা মৃদু এসিডে পরিণত হয়। এই মৃদু এসিডযুক্ত পানি বিভিন্ন শিলার উপর বিভিন্ন বিক্রিয়া করে থাকে।

চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$) বিশুদ্ধ পানিতে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত পানি (কার্বন এসিড) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন এসিড মিশ্রিত পানির সঙ্গে চুনা পাথরের বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম-বাই কার্বনেটে পরিণত হয় এবং তা সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অবসৃত হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঘটে :

$$CaCO_3 + \quad H_2O \rightarrow + CO_2 \quad \rightarrow \quad Ca(HCO_3)_2$$

(ক্যালসিয়াম কার্বনেট)+(পানি)+(কার্বন-ডাই-অক্সাইড)→(ক্যালসিয়াম-বাই-কার্বনেট)
চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে চুনাপাথর এই প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে।

ঙ। দ্রবণ (Solution):

সরাসরি পানির দ্বারা খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয় না বা গলে যায় না। কিন্তু শিলার মধ্যস্থিত কোনো কোনো খনিজ দ্রব্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন এক অবস্থায় এসে উপস্থিত হয় তখন তা সহজেই দ্রবীভূত হয়ে পড়ে বা গলে যায়। যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) যখন ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেটে পরিণত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, দ্রবণ প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন ঘটিয়ে থাকে।

বৃষ্টির পানিতে বায়ুমন্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অক্সিজেন (O_2) মিশ্রিত হয়ে দূর্বল কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) তৈরি করে। এ দ্রবণ মাটিতে পতিত হয়ে বহু অদ্রবনীয় খনিজকে দ্রবণীয় খনিজে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে, যা পরে পানিতে দ্রবীভূত হয়। চুনা পাথরের রাসায়নিক বিচূর্ণনে দ্রবণ প্রক্রিয়া শিলার সংযোগ স্থানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরও বড় ও গভীর খাড়া খাড়া পাড় বিশিষ্ট গর্তের সৃষ্টি করে। এ গর্তকে গ্রাইক বলে এবং গর্তসমূহ সমতল চূড়া বিশিষ্ট অনুভূমিক শিলার দেয়াল দ্বারা পৃথক, যা ক্লিন্ট (Clint) নামে পরিচিত।

পাঠসংক্ষেপ :

বিভিন্ন প্রকার খনিজের মিশ্রণে শিলা গঠিত হয়। শিলা ও খনিজের উপর বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো যেমন-অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বিক্রিয়া করে থাকে। এর ফলে কঠিন শিলা বিয়োজিত হয় এবং মূল খনিজগুলো নতুন গৌণ খনিজে পরিণত হয়ে সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন নিম্নোক্ত পাঁচটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন-(১) পানি যোজন (Hydration), (২) পানি বিয়োজন (Hydrolysis), (৩) জারন (Oxidation), (৪) অঙ্গারন (Carbonation) , ও (৫) দ্রবণ (Solution)। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে খনিজের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে হাইড্রেশান বলা হয়। পানি ভেঙ্গে হাইড্রোক্সিল আয়ন খনিজের মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে হাইড্রোলিসিস বলে। খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে অক্সিডেশান বলে। বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগকে কার্বনেশান বলে। বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগকে কার্বনেশান বলে। শিলার মধ্যস্থিত কোনো কোনো খনিজ দ্রব্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

১.১. রাসায়নিক বিচূর্নীভবন প্রক্রিয়ায় খনিজের গঠন কাঠামোর-
(ক) কোনো পরিবর্তন হয় না (খ) পরিবর্তন হয়
(গ) পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না (ঘ) শক্ত অবস্থায় থাকে

১.২. দ্রবণ ও কার্বনেশান কি ধরনের বিচূর্ণীভবনের আওতাভূক্ত-
(ক) প্রাকৃতিক (খ) রাসায়নিক
(গ) জৈবিক (ঘ) কোনটিই নয়

১.৩. ক্যালসিয়াম কার্বনেট পানিতে কিসের উপস্থিতিতে দ্রুত দ্রবীভূত হয়?
(ক) অক্সিজেন (খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড
(গ) সিলিকন (ঘ) কার্বন

২. শূণ্যস্থান পূরণ করুন:

২.১. শিলা বিভিন্ন ....সমন্বয়ে গঠিত।
২.২. আর্দ্র অঞ্চলে .... বিচূর্ণীভবন প্রধান।
২.৩. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে খনিজের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে .... বলা হয়।
২.৪. .... প্রক্রিয়ায় পানি (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+ions) এবং হাইড্রক্সিল (OH^-ions) আয়নে ভেঙ্গে যায়।
২.৫. খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে .... বলে।
২.৬. বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোজনকে .... বলে।
২.৭. খনিজ পদার্থ সরাসরি .... দ্বারা দ্রবীভূত হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে কি ধরনের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়?
২। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধানত কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়?
৩। হাইড্রেশান কি?
৪। হাইড্রোলিসিস কি?
৫। অক্সিডেশান কিভাবে সংঘটিত হয়?
৬। কার্বনেশান ও দ্রবণ কিভাবে বিচূর্ণীভবন সম্পন্ন করে?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলতে কি বোঝায়? রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে যে সমস্ত প্রক্রিয়া জড়িত সেগুলোর বিবরণ দিন।

পাঠ-৫.৪

বিচূর্ণীভবন : জৈবিক-প্রক্রিয়া
Weathering : Biological Process

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- জৈবিক বিচূর্ণীভবন কি;
- জৈবিক বিচূর্ণীভবন কিভাবে সংঘটিত হয় তা সম্পর্কে:
- উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং মানুষ কিভাবে বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করছে সে বিষয়ে; এবং
- শিলা বিচূর্ণীভবনের তারতম্যের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

যান্ত্রিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদ ও প্রাণীমন্ডল এবং মানুষের নানা প্রকার কর্মকান্ড ভূ-পৃষ্ঠের শিলাকে সর্বদা চূর্ণবিচূর্ণ করছে, একে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে। মানুষের দ্বারা শিলার বিচূর্ণীভবন সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে সহজে বোঝা যায় না।
জৈবিক বিচূর্ণীভবনকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। **উদ্ভিদের কার্য (Work of Plants) :**
শিলার খন্ড বিখন্ড হওয়ার কাজে গাছের শিকড় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিলার সংযোগস্থলে বা ফাটল খন্ড বিখন্ড হওয়ার কাজে গাছের শিকড়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাটলে চাপ বাড়তে থাকে। ফলে এক সময় শিলা বরাবর ভেঙ্গে যায়। ক্রমে মাটি আলগা হয়ে পড়ে। এতে বৃষ্টির পানি মাটির ভেতর প্রবেশ বরাবর ভেঙ্গে যায়। ক্রমে মাটি আলগা হয়ে পড়ে। এতে বৃষ্টির পানি মাটির ভেতর প্রবেশ করার সুযোগ পায়। এছাড়া মস, শৈবাল স্লাইকেল প্রভৃতি নানা প্রকার উদ্ভিদের দ্বারা শিলার ওপরিভাগে পানি আটকে থাকে। এ হিউমাস বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে আসলে জৈব এসিড (Organic Acid) উৎপন্ন করে। এ এসিড বিক্রিয়ার দ্বারা শিলাকে ক্ষয় করে। আবার বিভিন্ন প্রকারের জীবানু ও কীট তাদের দেহ নিঃসৃত রস দ্বারা জৈবিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

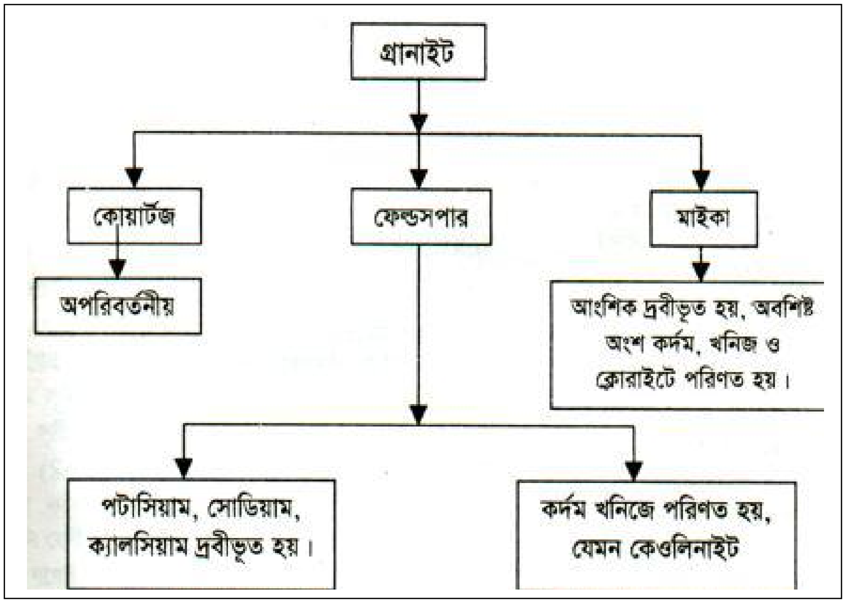

চিত্র : ৫.৪.১ গ্রানাইটের রাসায়নিক বিচূর্ণন

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে উদ্ভিদ মন্ডল তাদের শিকড় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে মৃত্তিকা ও শিলা চূর্ণকে আটকিয়ে রাখে। এর ফলে উপরিভাগের মৃত্তিকা ও শিলাচূর্ণ সহজে অন্যত্র অপসারিত হতে পারে না। এজন্য অধিক বৃক্ষচ্ছেদনে অতি দ্রুত ভূমি ও মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

২। **জীবজন্তুর কার্য (Work of Animals) :**
জীবজন্তু সর্বদা শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, ছুঁচো, পিঁপড়া, প্রেইরী, কুকুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়ে সর্বদা ওলট-পালট করে। তাছাড়া, উঁইপোকা, ইঁদুর, সাজারু, খরগোস, বেজী, শিয়াল প্রভৃতি জন্তু গর্ত করে অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবীর উপর মাটি তোলে। স্যাঁতসেতে, উষ্ণ আবহাওয়ায় কেঁচের গর্ত ও উইপোকার ঢিবি সহজেই চোখে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্তিকার অনুজীব (Bacteria) সমূহ শিলার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে যথেষ্ট সক্রিয় হয়। জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের দ্বারা ভূত্বক যেভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে এটা বেশ সূক্ষ্ম বলে এরূপ পরিবর্তন তেমন বোঝা যায় না।

৩। **মানুষের কার্য (Work of Man) :**
বর্তমানকালে মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য নানা ভাবে ভূত্বকের পরিবর্তন সাধন করছে। যেমন, রাস্তাঘাট, খাল, গৃহ, শহর প্রভৃতি নির্মাণ করার জন্য মানুষ সর্বদা ভূ-ত্বককে খন্ড-বিখন্ড করছে। মানুষ উঁচু স্থান ও পাহাড় কেটে সেই মাটি দিয়ে নিচু স্থান ভরাট করছে। এভাবে মানুষ জৈবিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে।

শিলা বিচূর্ণীভবনের তারতম্যের কারণ (Causes of Differential Weathering of Rocks): শিলার বিচূর্ণন প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিলার খনিজ উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো কোনো খনিজ যেমন, কোয়ার্টজ মোটেও ক্ষয় হয় না। অত্যন্ত দৃঢ় এবং দীর্ঘ সময় প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। অপরদিকে, অলভিন এবং ফেল্ডসপার অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ সহজেই ভাঙতে শুরু করে।

শিলার বুনট এ ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিলার ভেতর পানি প্রবেশ ক্ষমতা বা প্রবেশ্যতা (Permeability) ও সছিদ্রতা (Porosity) মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। শিলার প্রবেশ্যতা ও সছিদ্রতা বেশী হলে বিভিন্ন খনিজ উপাদান অতি সহজে বিচূর্ণন প্রক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাছাড়া বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণতাও শিলার বিচূর্ণনে কাজ করে। বিশেষ করে, এক্ষেত্রে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছাড়াও সারা বছরে বৃষ্টির বন্টন, মাটির ওপর কি পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় (পৃষ্ঠ প্রবাহ হিসেবে) এবং পানির বাষ্পায়নের পরিমানও গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত বিচূর্ণন নিয়ামকসমূহের তারতম্যের কারণে শিলার বিচূর্ণন হারে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে প্রধান শিলাসমূহের বিচূর্ণন প্রকৃতি তুলে ধরা হলো :

গ্রানাইট : এটি প্রধানত ফেল্ডসপার, কোয়ার্টজ ও মাইকা খনিজের সংমিশ্রনে গঠিত। ফেল্ডসপার পানির উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রুত বিশ্লেষিত হয়। এটি (Clevage) তল বরাবর পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্লোরাইড ও খনিজ গঠন করে। কোয়ার্টজ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক খনিজ গঠন করে। কোয়ার্টজ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উভয় বিচূর্ণন প্রক্রিয়ায় সহজে ভাঙ্গে না। ফলে গ্রানাইট বিচূর্ণনের ফলে কোয়ার্টজ অবশিষ্ট হিসেবে থেকে যায়।

ব্যাসল্ট : মিহি দানা বিশিষ্ট ব্যাসল্ট প্রধানত ফেল্ডসপার, অলভিন ও পাইরোক্সিন খনিজে গঠিত। এটি অত্যন্ত ভেদ্য এবং সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শিলার সব খনিজই ভেঙ্গে কর্দম ও আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়, যা লাল বা বাদামী রঙের মৃত্তিকায় রূপ নেয়।

বেলেপাথর : এটি প্রধানত কোয়ার্টজ দানা ও স্বল্প মাত্রার ফেল্ডসপার ও কর্দম খনিজে গঠিত। কোয়ার্টজ ক্ষয়রোধী হওয়ায় বেলেপাথরের সিমেন্ট জাতীয় পদার্থসমূহ রাসায়নিকভাবে আক্রান্ত হয়।

বেলে পাথরে প্রধান সিমেন্ট জাতীয় পদার্থের মধ্যে ক্যালসাইট, আয়রণ অক্সাইড এবং কোয়ার্টজ অন্যতম।

চুনাপাথর : চুনাপাথর প্রধানত ক্যালসাইট জাতীয় খনিজ দ্বারা গঠিত। এটি অন্যান্য খনিজের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয় প্রবণ। দ্রবণ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় হয়। আর্দ্র জলবায়ু সম্পন্ন এলাকায় চুনাপাথর ক্ষয় হয়ে গুহা জাতীয় ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। শুষ্ক এলাকায় খাড়া ভৃগু বা ক্লিফ (Cliff) তৈরী করে।

শেল : শেল মিহিকণা বিশিষ্ট ও নরম হওয়ায় দ্রুত ক্ষয় হয়।

প্রধান শিলা গঠনকারী খনিজ উপাদানসমূহের বিভিন্ন ধর্মী ক্ষয় প্রবণতার কারণে একই শিলা বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষয় হয়। একে ভেদময় বিচূর্ণন (Differential weathering) বলে। ভেদময় বিচূর্ণন বড় বা ছোট জায়গা ব্যাপী সংঘটিত হতে পারে। যেমন-বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের গাত্র থেকে শুরু করে দ্রতায়তনের একটি পাললিক শিলাস্তরে ভেদময় বিচূর্ণন সংঘটিত হতে পারে। ভূমিরূপের ক্ষয়রোধী শিলাসমূহ অক্ষত থাকায় উঁচু শিলার সৃষ্টি করে এবং বাকী অংশ ক্ষয় হয়ে উপত্যকায় পরিণত হয়।

পাঠসংক্ষেপ :

উদ্ভিদ ও প্রাণীমন্ডল এবং মানুষ কর্তৃক শিলার চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে্ গাছের শিকড় শিলার খন্ড-বিখন্ড হওয়ার কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিলার ফাটল বরাবর গাছের শিকড়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাটলে চাপ বাড়তে থাকে। ফলে এক সময়ে শিলা ফাটল বরাবর ভেঙ্গে যায়। জীবজন্তু সর্বদা শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, পিঁপড়া, প্রেইরী কুকুর প্রভৃতি মাটি খুড়েঁ সর্বদা ওলট-পালট করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্তিকার অনুজীবসমূহ শিলার প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে যথেষ্ট সক্রিয় হয়। মানুষ তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে নানা ভাবে ভূত্বকের পরিবর্তন সাধন করছে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, শহর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ ভূত্বককে খন্ড-বিখন্ড করছে। শিলার বিচূর্ণীভবন অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলোর মধ্যে শিলার খনিজ উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিলার বুনট, কোনো স্থানের বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা প্রভৃতি বিচূর্ণীভবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১.১. জৈবিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়-
(ক) উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ (খ) খনিজ পদার্থ
(গ) আবহাওয়া ও জলবায়ু (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

১.২. অধিক বৃক্ষচ্ছেদনে ভূপৃষ্ঠের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়?
(ক) ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় (খ) উর্বরতা হ্রাস পায়
(গ) ভূমি অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (ঘ) দ্রবণ ক্ষমতা কম হয়।

১.৩. শেল মিহিকণা বিশিষ্ট ও নরম হওয়ায়-
(ক) দ্রুত ক্ষয় হয় না (খ) দ্রুত ক্ষয় হয়
(গ) শক্ত বাঁধন বিশিষ্ট (ঘ) দ্রবণ ক্ষমতা কম হয়।

২. শূণ্যস্থান পূরণ করুন:

২.১. শিলার বিচূর্ণীভবন অনেকগুলো ....দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২.২. .... প্রধানত ফেল্ডসপার, কোয়ার্টজ ও মাইকা খনিজের সংমিশ্রনে গঠিত।
২.৩. চুনাপাথর প্রধানত .... জাতীয় খনিজ দ্বারা গঠিত।
২.৪. শেল মিহিকণা বিশিষ্ট ও নরম হওয়ায় দ্রুত .... হয়।
২.৫. শিলার বিচূর্ণীভবন অনেকগুলো .... দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. জৈবিক বিচূর্ণীভবন কি?
২. উদ্ভিদ কিভাবে বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন?
৩. প্রাণীর বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন?
৪. মানুষ কিভাবে জৈবিক বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে তা আলোচনা করুন।
৫. শিলার উপাদান ও বুনট কিভাবে বিচূর্ণীভবনে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।
৬. ভেদময় বিচূর্ণন বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলতে কি বোঝায়? জৈবিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়াসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫.৫

ভূমিরূপ ও মৃত্তিকা গঠনে বিচূর্ণীভবন ও স্তুপক্ষয়ের প্রভাব
Impact of Weathering On Landform and Mass Wasting

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বিচূর্ণীভবন ভূমিরূপ ও মৃত্তিকা গঠনে কি ধরনের ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বৈষম্যমূলক বিচূর্ণীভবনের ফলে কি কি ধরনের গৌণ ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাদের নাম জানতে পারবেন;
- চুনাপাথর অঞ্চল, উঁচু পর্বত অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- স্তুপ ক্ষয় কি এবং প্রকারভেদ ও স্তুপ ক্ষয়ের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- ভূমিরূপের ওপর স্তুপ ক্ষয়ের প্রভাব জানতে পারবেন।

বিচূর্ণীভবন ভূমিরূপ গঠনে প্রত্যক্ষভাবে তেমন জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে স্তুপ ক্ষয় ও ক্ষয়কার্যকে ত্বরান্বিত করে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াগুলোই ভূমিরূপ গঠনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে। বিচূর্ণীভবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো যে এটি ভূ-পৃষ্ঠে আলগা পদার্থের সংস্থান করে মৃত্তিকা গঠনে সহায়তা করে। বিচূর্ণী আলগা পদার্থই মৃত্তিকা গঠনের প্রথম ধাপ।

ভূমিরূপ গঠনে বিচূর্ণীভবন সরাসরি দুই ভাবে অংশ গ্রহণ করে। যথা (১) দ্রবণ জনিত পদার্থের অপসারণ সম্পর্কিত উচ্চতা হ্রাস; ও (২) বৈষম্যমূলক আচরণ করে ক্ষুদ্র ভূমিরূপের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে বিচূর্ণীভবনের প্রত্যক্ষ ফল স্থুল ভূমিরূপের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈষম্যমূলক বিচূর্ণীভবনে সৃষ্ট গৌণ ভূমিরূপ :

১। **ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাসকরণ** : চুনাপাথর, ডলোমাইট, জিপসাম প্রভৃতি শিলাগঠিত অঞ্চলের উচ্চতা ক্রমাগত দ্রবণের ফলে হ্রাস পায়।

২। **ভূমিরূপের সৃষ্টি ও পরিমার্জন** : বৈষম্যমূলক বিচূর্ণীভবনের ফলে কিছু কিছু গৌণ ভূমিরূপ যেমন শিলা সোপান, মৌচাকের মতো গর্তযুক্ত শিলা পৃষ্ঠ, পাঁজর ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। পাতলা শিলাস্তর দিয়ে গঠিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের ওপর বৈষম্যমূলক বিচূর্ণীভবনের ফলে স্তরীয় শিলা পাঁজর (Stratification Rib) সৃষ্টি হয়। অনুরূপ প্রক্রিয়ার ফলে শিলাময় খাড়াতলে গর্ত, অল্প উদগত শিলা, খাঁজ প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম রূপের সৃষ্টি হয়।

চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে দ্রবণের ফলে সোয়ালো হোল, ডোলিন প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের গর্তের সৃষ্টি হয়। গ্রানাইট বা অনুরূপ শিলায়ত এই ধরনের বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার গর্ত বিচূর্ণীভবনের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে মনে হয়। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় পর্বতের পাদদেশে প্রধানত সমতল অংশে স্মিত (Smith) এই ধরনের গর্ত লক্ষ্য করেন। এলগি ও মস এরকম গর্ত সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে বলে অনুমান করা হয়। কোনো কারণে একটি স্থান ঈষৎ নিচু হলে ঐ অংশে পানির সংস্থান বেশী থাকে বলে এলগি, মস উদ্ভিদ জন্মে। এই সমস্ত উদ্ভিদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা যথেষ্ট পানি ধারণ করতে পারে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। ফলে এই অশে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বৃদ্ধি পায় ও গর্তের আয়তন বেড়ে বিচূর্ণীভবন গর্তের (Weathering pit) সৃষ্টি হয়। লবন কেলাসন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওল, ট্যাফোনির মতো ক্ষুদ্র গর্ত সৃষ্টি হয়।

উঁচু পর্বত অঞ্চলে তুষারের ক্রিয়ায় প্রস্তর খন্ড সমন্বিত ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টি হয় এদেরকে ফেলসেনমিয়ার (Felsenmeere) বলে। এরকম বড় শিলাখন্ডগুলো বিচূর্ণীভবনের ফলে গোলাকার রূপ ধারণ করে।

অনেক সময় পাতালিক আগ্নেয় শিলার ভার লাঘব জনিত প্রসারণের ফলে বল্কমোচনী গম্বুজের (Exfoliation Dome) সৃষ্টি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টোন মাউন্টেন এরকম বল্কমোচন গম্বুজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

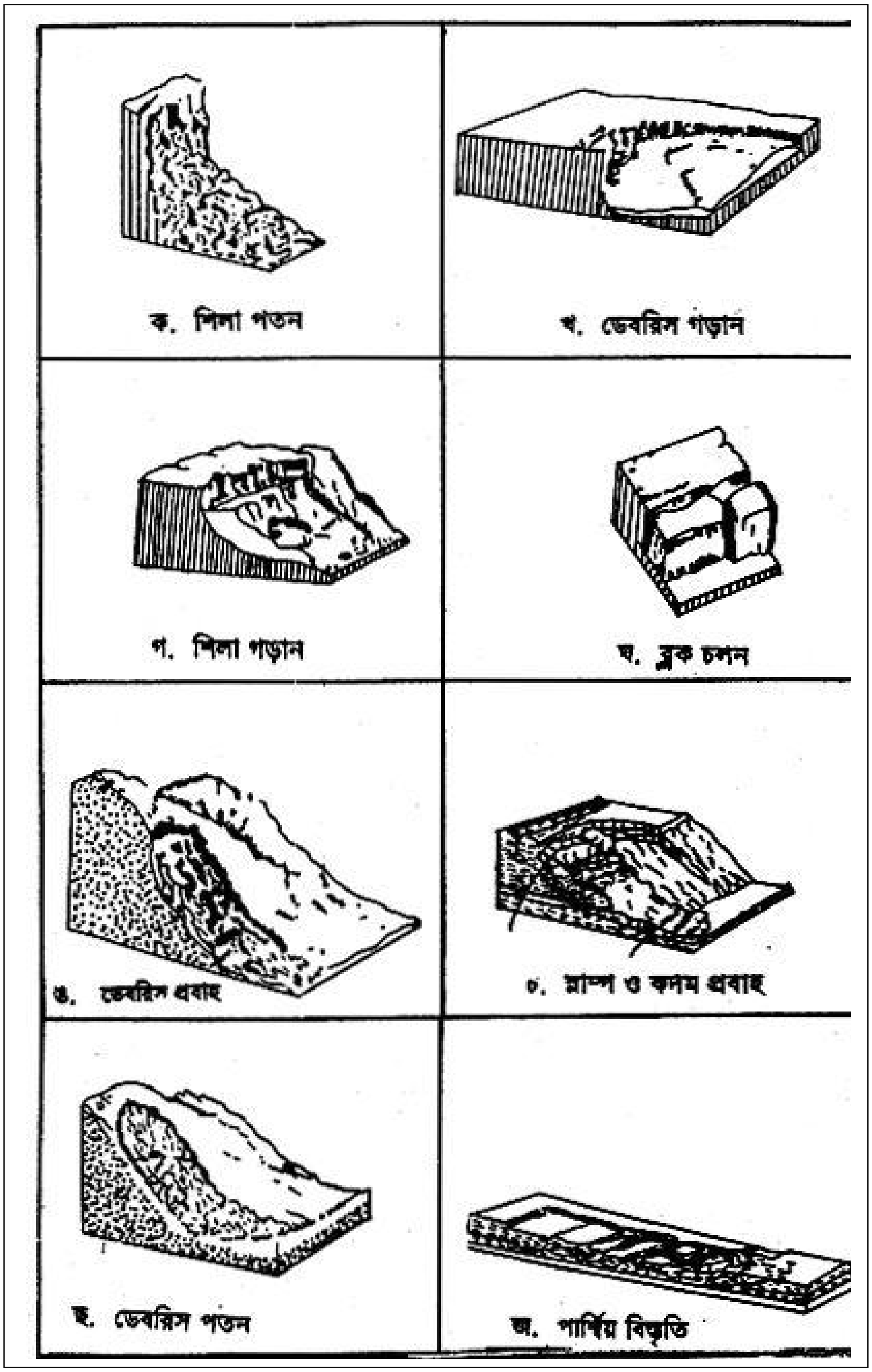

চিত্র : ৫.৫.১ : বিভিন্ন ধরনের পুঞ্জিত ক্ষয় (Mass Movemeat)

উঁচু পর্বতের খাড়া ঢালে তুষারের ক্রিয়ায় সৃষ্ট শিলাখন্ড গড়িয়ে এসে ঢালের পাদদেশে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে ত্রিভূজাকৃতি ট্যালাস শঙ্কু (Talus Cone) সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র বিচূর্ণীভবনের সাহায্যে কোনো ভূমিরূপের গঠন ব্যাখ্যা প্রায় অসম্ভব। কারণ বিচূর্ণীভবনের যথার্থ সংজ্ঞা অনুসারে ভগ্নপ্রায় শিলার স্থানান্তর ঘটে না। ওপরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ভূমিরূপের কথা বলা হলো ক্ষয়কার্য ছাড়া শুধুমাত্র বিচূর্ণীভবনের সাহায্যে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না তবে একথা ঠিক যে এই সব ভূমিরূপ সৃষ্টিতে বিচূর্ণীভবনের ভূমিকাই প্রধান।

স্তুপ ক্ষয় (Mass Wasting) :

শার্প (Sharpe) -এর বিস্তৃত গবেষণার ফলে ডেবরিস ও মৃত্তিকা স্থানান্তরে স্তুপ ক্ষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্তুপ ক্ষয় ও ক্ষয়ের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যদিও সব সময় এটা খুব সহজে করা যায় না। সরাসরি অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে ভূমির ঢাল বেয়ে ডেবরিস ও মৃত্তিকার স্থানান্তরকে স্তুপ ক্ষয় বলে। পানির উপস্থিতি স্তুপ ক্ষয়কে সাহায্য করতে পারে কিন্তু পানির পরিমান এমন বেশী হবে না যে তাকে পরিবহনের মাধ্যমে বলা যায়। অপরপক্ষে ক্ষয়ের ক্ষেত্রে একটা গতিশীল মাধ্যম থাকে যা প্রবাহ পথের ওপর বা তার বাইরের বিচূর্ণী পদার্থ সংগ্রহ ও পরিবহন করে অপসারণ করে। যেমন, সমুদ্র তরঙ্গ ও ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষেত্রে পানি হিমবাহের ক্ষেত্রে বরফ ও বাতাসের ক্ষেত্রে বায়ু এরূপ পদার্থের অপসারণ ঘটায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ক্ষয় প্রক্রিয়ায় পরিবহণ মাধ্যমের ঘোলা নদী (Muddy Stream) ও কর্দম প্রবাহের (Mud Flow) মধ্যে সীমারেখা টানতে যাই তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়। শর্প-এর মতে ডেবরিস (Debris) স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর মতো যার এক প্রান্তে রয়েছে নদী, হিমবাহ প্রভৃতি ক্ষয়কারী শক্তিগুলো ও অন্য প্রান্তে রয়েছে স্তুপ ক্ষয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো। এদের মধ্যে সীমারেখা টানা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক। অনুরূপভাবে স্তুপ ক্ষয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন-কর্দম প্রবাহ, মৃত্তিকা প্রবাহ, ডেবরিস সম্প্রপাত ও ধস প্রভৃতি বিভিন্ন স্তুপ ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলো একটা ধারাবাহিক শ্রেণী তৈরী করে।

স্তুপক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ :

শার্প স্তুপ ক্ষয়কে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-ধীর প্রবাহ, ধ্রুত প্রবাহ, ধস ও অধোনমন (Subsidence) । শার্প স্তুপ ক্ষয়কে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-ধীর প্রবাহ, দ্রুত প্রবাহ, ধস ও অধোনমন (Subsidence)। এই প্রধান বিভাগগুলেকে আবার কতকগুলো উপবিভাগে ভাগ করেছেন।

ক) ধীর প্রবাহ (Slow Flow) : ভূমিপাত (Creep) ঢাল বেয়ে মাটিও শিলাচূর্ণের ধীর চলন।

দীর্ঘায়িত পর্যবেক্ষণের ফলেই এরকম চলন বোঝা যায় :

১) মৃত্তিকা পাত (Soil Creep) : ঢাল বরাবর মাটির চলন।

২) ট্যালাস পাত (Talus Creep) : ঢাল বরাবর ট্যালাস বা স্ক্রী এর চলন।

৩) শিলা পাত (Rock Creep) : ঢাল বরাবর শিলাখন্ডের একক চলন।

৪) শিলা-হিমবাহ পাত (Rock-Glacier Creep) : ঢাল বরাবর চূর্ণশিলা সঞ্চয়ের প্রান্ত ভাগের চলন।

৫) সোলিফ্লাক্সান (Solifluction) : সুনির্দিষ্ট খাত ছাড়া পানি সম্পৃক্ত অবস্থায় ঢাল বরাবর ডেবরিসের সজ্ঞবদ্ধ চলন।

খ) দ্রুত প্রবাহ (Rapid Flow) :

১) কর্দম প্রবাহ (Mud Mlow) : নদীমঞ্চ ও পাহাড়ের নিম্ন ঢালযুক্ত অঞ্চলে পানি সম্পৃক্ত অবস্থায় কর্দম ও পলি সমৃদ্ধ মাটির চলন।

২) মৃত্তিকা প্রবাহ (Earth Flow) : সুনির্দিষ্ট খাত বেয়ে পানি সম্পৃক্ত শিলা ডেবরিস দ্রুত বা ধীর চলন।

৩) ডেবরিস প্রবাহ বা সম্প্রপাত (Debris Avalanche) : খাড়া ঢালে সংকীর্ণ খাতের মধ্য দিয়ে পাতের আকারে শিলা ডেবরিস চলন।

গ) **ভূমিধ্বস (Land Slide) :** অপেক্ষাকৃত শুষ্ক প্রকৃতির মাটি ও শিলা ডেবরিস এমন চলন যা সহজেই বোঝা যায়।

১) স্খলন (Slump) : কোনো এক বা একাধিক বক্রতল বরাবর ডেবরিস সংস্থানের পতন।

২) ডেবরিস পাত (Debris Creep) : কোনো দুর্বল তল বরাবর শিলা মৃত্তিকা নিম্ন ঢাল বরাবর অগ্রসর হওয়া।

৩) ডেবরিস প্রপাত (Debris Fall) : উল্লম্ব বা ঝুঁকে থাকা তল থেকে প্রায় অবাধ ডেবরিস পতন।

৪) শিলাখন্ড ধস (Rock Slide) : স্তরায়ন, ফাটল বা চ্যুতি তল বরাবর শিলা সংস্থানের গড়িয়ে পড়া।

৫) শিলা প্রপাত (Rock Fall) : খাড়া তল থেকে শিলাখন্ডের অবাধ পতন।

ঘ) **অধোগমন বা অধোনমন (Subsidence)** : নিম্নস্থিত পদার্থের সমৃদ্ধকরণ বা গহ্বরের ছাদের ধস জনিত কারণে শিলা ও মাটির উপরিভাগ ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ধসে যাওয়া। চুনাপাথর যুক্ত সমভূমি বা পাহাড়ী অঞ্চল এবং পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্তুপ ক্ষয়ের কারণ : যখন কোনো ঢাল বরাবর ডেবরিস সঞ্চয় থাকে তখন এর উপর যে অভিকর্ষ বল কাজ করে তাকে দুটো উপভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি উপভাগ ভূমির ঢালের অভিলম্ব দিকে ও অপর উপভাগ নিম্ন ঢাল বরাবর কাজ করে। স্থিতিশীল ডেবরিস চলনের উপযোগী অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন ডেবরিস অভিলম্বিক পীড়ন ও ভূমির ঢাল বাড়ে বা শিলার সহনশীলতা কমে।

নিম্নে স্তুপ ক্ষয়ের বিশেষ কারণগুলো তালিকার আকারে প্রকাশিত হলো :

ক) ভূমির ঢাল নানা ভাবে বাড়তে পারে। যথা

১) নদী, হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গের কার্যের ফলে ঢালের নিম্ন অংশে ক্ষয় বেশী হলে।

২) বিচূর্ণীভবনের ফলে;

৩) ধ্বস, অধোনমন, শিলা প্রপাতের ফলে;

৪) প্রস্তর খনি, খাল খনন, রাস্তা তৈরির ফলে;

৫) হ্রদ বা কৃত্রিম জলাধারে জলতলের পরিবর্তনের ফলে।

খ) ঢালের ওপর বোঝার চাপ নিম্নলিখিত কারণে বাড়তে পারে, যথা,

১) বৃষ্টি ও তুষারপাত, পানির পাইপ লাইন, পয়ঃপ্রণালী এবং খাল নির্মাণ;

২) ট্যালাস সঞ্চয়;

৩) উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বৃদ্ধি;

৪) নিম্ন প্রবাহী ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি;

৫) গৃহ নির্মাণ, আবর্জনা নিক্ষেপ ইত্যাদি।

গ) উপরিস্থ শিলা অপসারণের কারণগুলো নিম্নরূপ হতে পারে, যেমন,

১) নদী ও সমুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে নিম্ন ভাগ বসে যাওয়া;

২) চুনাপাথর ও অন্যান্য দ্রব্য শিলার গহ্বরীকরণ, ভূ-নিম্নস্থ খনি;

৩) নিম্নস্থিত অবক্ষেপের সহশীলতা হ্রাস;

৪) নিম্নস্থিত অস্থিতিস্থাপক পলির সমৃদ্ধি।

ঘ) শিলার সহনশীলতা নিম্নলিখিত কারণে কমতে পারে, যেমন,

১) কাদার ফাটলে পানি ঢুকে একে নরম করে দিতে পারে;

২) শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন, নিরেট শিলা থেকে ভাঙ্গা শিলার সহনশীলতা কম হয়;

৩) পানির অধিশোষণের ফলে কর্দম খনিজের সংযুক্তি হ্রাস, স্ফীত;

৪) কর্দম ও সেলে শুষ্ককরণ→ভাঙ্গন→সংযুক্তি হ্রাস→পানির অণুপ্রবেশ ও কোমলতা প্রাপ্তি;

৫) দ্রবণের ফলে পাললিক শিলার সিমেন্টের অপসারণ→ভাঙ্গন→সংযুক্তি হ্রাস→পানির অনুপ্রবেশ ও কোমলতা প্রাপ্তি।

৬) আয়ন বিনিময় রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত ভৌত ধর্মের পরিবর্তন;

৭) পানি সম্পৃক্তির ফলে প্লাবতা বৃদ্ধি। আন্তঃকণা চাপ ও ঘর্ষণ হ্রাস, কৈশিক পানি সম্পর্কিত সংযুক্তি হ্রাস।

৮) পানি শোষণের ফলে ডেবরিসের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস;

৯) জীবজন্তুর খোড়াগর্ত ও উদ্ভিদ শিকড়ের পচনের ফলে ডেবরিসের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন।

ওপরোক্ত কারণগুলো সক্রিয়ভাবে স্তুপ ক্ষয়ে প্রভাব বিস্তার করলেও শিলা স্তারায়ন ও গঠন সংক্রান্ত কতকগুলো কারণ সময় বিশেষ স্তুপ ক্ষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে বিভিন্ন ধরনের স্তুপ ক্ষয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ স্বতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় (চিত্র-৫.৫.১)। নিম্নে ক্ষয়ের প্রধান প্রক্রিয়াগুলোর বৈশিষ্ট্য ও কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

মৃত্তিকা পাত (Soil Creep) : ঢাল বেয়ে অতি ধীর কিন্তু অব্যাহত হারে বিচূর্ণীভবন পদার্থ, মাটি প্রভৃতির স্থানান্তরকে মৃত্তিকা পাত বা ক্রীপ বলে। ক্রীপ হলো ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি অংশে সংঘটিত প্রক্রিয়া। ক্রীপ নানা ভাবে হতে পারে। যেমন-

১) অভিকর্ষের প্রভাবে যে পীড়নের উদ্ভব হয় তা শিলা সহনশীলতা অতিক্রম করলে সূক্ষ্ম ব্যবধানে বহু সংখ্যক কৃন্তন তলের সৃষ্টি হয় ও পদার্থ কণার চলন ঘটে।

২) তাপমাত্রাজনিত প্রসারণ ও সংকোচনও ক্রীপে সাহায্য করে। দিনের বেলা তাপমাত্রা বাড়ার ফলে কোনো আলগা শিলা বা মৃত্তিকা কণা ঠেলা খেয়ে ঢালের লম্ব দিকে উঠে যায় কিন্তু ঠান্ডা হবার সময় একই পথে না ফিরে উল্লম্ব পথে ফিরে আসে। এর মোট ফল হলো ঐ কণার ঢাল বরাবর অল্প চলন।

কর্দম প্রবাহ ও সোলিফ্লাক্সান : সছিদ্র ডেবরিস যখন পানি সম্পৃক্ত হয় তখন এটা সান্দ্র তরলের মত প্রবাহিত হতে থাকে। সুমেরু অঞ্চলে এই ধরণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে আলগা ডেবরিস যুক্ত অঞ্চলের নিচে অপ্রবেশ্য কাদা বা অন্য কোনো অপ্রবেশ্য শিলা থাকলে একই ভাবে শীতের পর তুষার গলা পানিতে সম্পৃক্ত হয়ে ডেবরিস প্রবাহ হতে পারে। সোলিফ্লাক্সান থেকে আরও বড় আকারের পানি সম্পৃক্ত অবস্থায় ডেবরিস প্রবাহকে কর্দম প্রবাহ বলে। মুষলধারে বৃষ্টি বাড়ার সময় ডেবরিস ফাঁকে ফাঁকে পানি ঢুকলে এর সহনশীলতা কমে যায় ও কর্দম প্রবাহের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়। সোলিফ্লাক্সান ও কর্দম প্রবাহ বছরে কয়েক

সে.মি. থেকে কয়েক মিটারের ও বেশী হতে পারে। মৃত্তিকা প্রবাহ কর্দম প্রবাহ থেকে দ্রুততর হয়। বেশ খাড়া তলে এক দিনের প্রবাহ কয়েক মিটার হতে পারে।

ধ্বস : কোন দুর্বল অংশ যেমন স্তরায়ন তল, শিলা তল বরাবর স্খলিত হয়ে সুসংবদ্ধ শিলা ও ডেবরিস সংস্থানের নিম্ন ঢাল বরাবর বিসর্পণকে ধস বলে। পরে অবশ্য ধস প্রাপ্ত পদার্থ চলনকালে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়।

স্লাম্প ধ্বসের মতোই এক ধরনের ধীর সঞ্চরনশীল প্রক্রিয়া। তবে এখানে স্খলিত তল ধসের মতো সমতল না হয়ে বক্র হয়। ভূমিকম্প, আগ্নেয় বা কৃত্রিম বিস্ফোরণে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তা দুর্বল তলের ঘর্ষণজনিত বলকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে ও ধস বা স্লাম্পের সৃষ্টি করতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ :

বিচূর্ণীভবন ভূমিরূপ গঠনে প্রত্যক্ষ ভাবে তেমন জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে স্তুপক্ষয় ক্ষয়কার্যকে ত্বরান্বিত করে। বিচূর্ণীভূত আলগা পদার্থই মৃত্তিকা গঠনের প্রধান ধাপ। ভূমিরূপ গঠনে বিচূর্ণীভবন দুই ভাবে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। যেমন- দ্রবণজনিত পদার্থের অপসারণ সম্পর্কিত উচ্চতা হ্রাস ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে ক্ষুদ্র ভূমিরূপের গঠন। তবে একথা ঠিক যে ভূমিরূপের গঠনে বিচূর্ণীভবনের ভূমিকাই প্রধান।

স্তুপক্ষয় ও ক্ষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় খুবই কঠিন ব্যাপার। সরাসরি অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে ভূমির ঢাল বেয়ে ডেবরিস ও মৃত্তিকার স্থানান্তরকে স্তুপক্ষয় বলে। স্তুপক্ষয়কে ৪টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, ধীর প্রবাহ (Slow Flow), দ্রুত প্রবাহ (Rapid Flow), ভূমি (Land Slide) ধ্বস ও অধোনয়ন বা অধোগমন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) দিন:

১.১. ভূমিরূপ গঠনে বিচূর্ণীভবন সরাসরি কত ভাবে অংশগ্রহণ করে?
ক) ৪ খ) ২ গ) ৫ ঘ) ৩

১.২. চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি শিলাগঠিত অঞ্চলে উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাসের কারণ-
ক) জৈবিক ক্ষয়সাধন খ) যান্ত্রিক ক্ষয়সাধন
গ) দ্রবণ ঘ) কোনটিই নয়।

১.৩. এলগি, মস প্রভৃতি কোন জাতীয় বিচূর্ণীভবনকে বৃদ্ধি করে?
ক) যান্ত্রিক খ) রাসায়নিক গ) জৈবিক ঘ) কোনটিই নয়।

১.৪. বৈষম্যমূলক বিচূর্ণীভবনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে স্তম্ভ ও নানা আকৃতির শিলাকে সম্মিলিতভাবে কি বলে?
ক) গম্বুজ খ) হুড (Hood)
গ) ফেলসেনমিয়ার ঘ) কোনটিই নয়।

১.৫. শিলার নগ্নীভবনে কোনটির পরে কোন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়?
ক) বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন খ) ক্ষয়সাধন ও নগ্নীভবন
গ) বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবন ও ক্ষয়সাধন ঘ) যে কোনটি প্রথম হতে পারে।

১.৬. চুনাপাথর অঞ্চলে দ্রবণের ফলে সোয়ালো হোল, ডোলিন প্রভৃতি গর্তের সৃষ্টির কারণ-
ক) অবক্ষেপন খ) বিচূর্ণীভবন
গ) নগ্নীভবন ঘ) স্তুপ ক্ষয়

১.৭. মৃত্তিকা গঠনের জন্য আলগা পদার্থের সরবরাহের প্রথম ধাপ হলো-
ক) ক্ষয়সাধন খ) সঞ্চয়ন
গ) বিচূর্ণীভবন ঘ) স্থানান্তকরণ

১.৮. কোনটি স্তুপ ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভূক্ত নয়?
ক) ধীর প্রবাহ খ) ধস ও অধোনমন
গ) দ্রুত প্রবাহ ঘ) উর্ধ্ব প্রবাহ

১.৯. নিম্নের কোনটি স্তুপ ক্ষয়ের জন্য সহায়ক নয়?
ক) ভুমির ঢাল বৃদ্ধি খ) ঢালের উপর বোঝার চাপ বৃদ্ধি
গ) শিলার সহনশীলতা হ্রাস ঘ) ভূমির ঢাল হ্রাস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভূমিরূপ গঠনে বিচূর্ণীভবন পরোক্ষভাবে যে ধরনের ভূমিকা রাখে ও যে সকল ভূমিরূপ গঠন করে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। স্তুপ ক্ষয় বলতে কি বোঝায়? স্তুপ ক্ষয়ের শ্রেণীবিভাগ করে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩। স্তুপ ক্ষয়ের কারণসমূহ তালিকা আকারে লিখুন। স্তুপ ক্ষয়ের প্রধান প্রক্রিয়াগুলোর বৈশিষ্ট্য ও কারণ বিশ্লেষণ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ভূমিরূপের ওপর বিচূর্ণী ভবন ও স্তুপক্ষয়ের প্রভাব বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫.৬

নদী
River

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- নদী কি, নদী প্রবাহের ধরণ এবং নদীর পানি প্রবাহের নিয়ামক সম্পর্কে; এবং
- বিভিন্ন পর্যায়ে নদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্নঢালাভিমুখী প্রাকৃতিক পানি প্রবাহকে নদী বলে। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত কোথাও উপনদী মূল নদীতে এসে মিলে, আবার কোথাও মূল নদী বিভক্ত হয়ে শাখা নদীর সৃষ্টি করে। মূল নদী, এ ধরনের উপনদী ও শাখা নদীসহ একত্রে নদী অববাহিকা গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে 'নদ' ও 'নদী-র পার্থক্যকরণ প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় এই পার্থক্যকরণ প্রয়োজন। ইংরেজি (River) বলতে উভয়কে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় 'নদ' পুংলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয় অর্থাৎ যে সমস্ত নদীর শাখা নদী নেই সেগুলিকে বুঝিয়ে থাকে (তবে উপনদী থাকতে পারে)। অপরদিকে 'নদী' স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয় এবং শাখা নদী সম্পন্ন হয়ে থাকে। ব্রক্ষপুত্র ও সিন্দু নদ এবং গঙ্গা, মিসিসিপি ইত্যাদি নদী বলে পরিচিত। প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকা আছে যা পানি অববাহিকা বা পর্যঙ্ক (Water Basin) নামে পরিচিত। প্রতিটি নদী অববাহিকা পার্শ্ববর্তী অববাহিকা থেকে পানি বিভাজিকা (Water Divide) দ্বারা পৃথক থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি নদী অববাহিকা শুধুমাত্র তার নিজস্ব ভৌগলিক সীমানার পানি নিষ্কাষণ করে।

নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও ঢালু জায়গা। পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানি পাওয়া যায় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চল হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। হিমালয় পর্বতে বৃষ্টি, বরফ গলা পানি ও প্রস্রবনের পানি মিলিত হয়ে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর সৃষ্টি হয়েছে।

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্নচাপ অভিমুখী প্রাকৃতিক পানি প্রবাহকে নদী বলে।

নদী খাতের আকৃতি (Channel Form) : প্রতিটি নদী একটি খাতে প্রবাহিত হয় এবং এ প্রবাহ বিভিন্ন ধরনের নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। নদী খাতের একটি আড়চিত্র (Cross Profile)

(চিত্র-৫.৬.১) আঁকলে যে বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রস্থ : নদী খাতের দুই তীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব। এটি মিটারে প্রকাশ করা হয়।

২। গভীরতা : এটি নদী খাতের তলদেশ থেকে খাড়াভাবে পানির উপর পর্যন্ত দূরত্ব, যা মিটারে প্রকাশ করা হয়।

৩। ঢাল : অনুভূমিক ও নদীতলের কৌণিক অবস্থান।

৪। পেবগ : নদী খাতে যে গতিতে পানি প্রবাহিত হয় তাকে বেগ বলে। নদীর বেগ উপরিভাগে সবচেয়ে বেশী এবং দুই তীর ও তল

চিত্র : ৫.৬.১ : নদী খাতের আড় চিত্র

বরাবর ঘর্ষণের কারণে কম হয়।

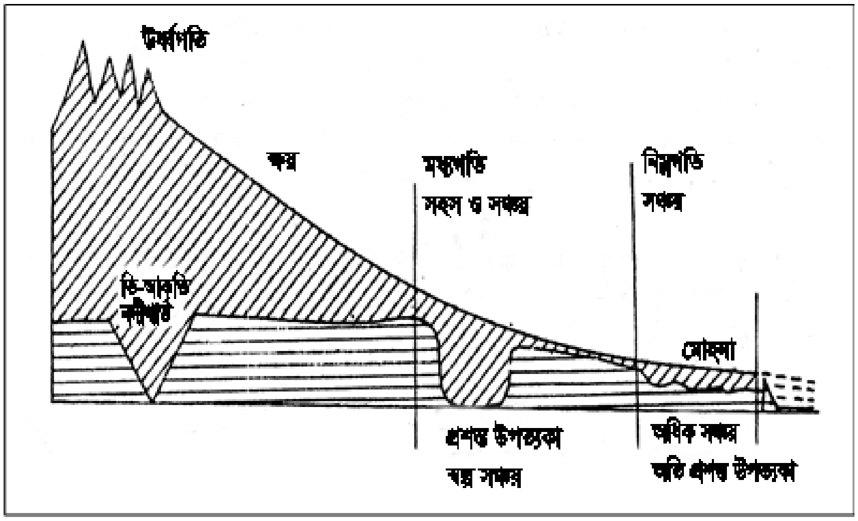

চিত্র : ৫.৬.২ : আদর্শ নদীর বিভিন্ন গতিপ্রবহা

৫। পানি ধারণকৃত অংশের সীমানা (Wetted Perimeter) : নদীখাত এবং পানির সংযোগ রেখার দৈর্ঘ্য।

নদী প্রবাহ (Channel Flow) : প্রকৃতিক নদী প্রবাহ পানি দুই ভাবে বয়ে যায়। যেমন, (ক) পত্রবৎ প্রবাহ (Laminer Flow) - যেখানে পানি অনুভূমিক ভাবে তলদেশ বরাবর প্রবাহিত হয়, এবং (খ) ঘূর্ণী প্রবাহ (Turbulent Flow) -যেখানে পানি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নিম্ন ঢালে অগ্রসর হয়। পত্রবৎ প্রবাহ প্রাকৃতিক নদীতে খুব বেশী দেখা যায় না, তবে ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নদীর পানি প্রবাহ অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিহত হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপ :

১। পানির পরিমাণ (Volume of Water)

২। বেগ (Velocity),

৩। নদী খাতের আকার ও আকৃতি (Channel Form and Shape)

৪। ঢাল (Slope),

৫। নদী খাতের ভিত্তি তল (Base Level), সর্বনিম্নতল যার নিচে নদী ক্ষয় করে না, এবং

৬। পলির পরিমাণ ও ধরণ (Volume and Types of Sediments)

নদী বিভিন্ন অবস্থা বা গতি (Different Stages or Courses of River)
উৎস হতে মোহনায় পতিত হওয়া পর্যন্ত নদীর গতি পথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন-(১) পার্বত্য অবস্থা বা উর্ধ্বগতি, (২) সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি এবং (৩) ব-দ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি।

১। পার্বত্য অবস্থা বা উর্ধ্বগতি বা যৌবন অবস্থা (Mountain or Upper Course at Young Stage) : পার্বত্য অবস্থা নদীর প্রাথমিক অবস্থা। পর্বতের ওপরে উৎপত্তি স্থল হতে সমভূমিতে পৌছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর পার্বত্য অবস্থা বা উর্ধ্বগতি বলা হয়। গঙ্গা নদী গঙ্গোত্রী হতে হরিদ্বার পর্যন্ত ৩২০ কি.মি (২০০ মাইল) অংশ এর পার্বত্য বা উর্ধ্ব প্রবাহ। পার্বত্য অবস্থায় ক্ষয় সাধনই নদীর প্রধান কাজ।

পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিভাগ খুব ঢালু ও উঁচু-নিচু হয়। সেজন্য নদী উচ্চ স্থান হতে খাড়া পর্বত গাত্র বেয়ে প্রচন্ড গতিতে নেমে আসে। এ সময় নদীর গতিবেগ ঘন্টায় ২৪ কি.মি থেকে ৩২ কি.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। পার্বত্য অবস্থায় নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয়ই বেশী হয়ে থাকে। ফলে গিরিখাত ক্যানিয়ন, খরস্রোত, জলপ্রপাত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

পার্বত্য প্রবাহে নদী স্থল ভাগকে ক্ষয় করে এবং ক্ষয়িত অংশ পরিবহন করে। পার্বত্য অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়সাধন ও বহন হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল হঠাৎ কমে নদীর গতি হ্রাস পেলে অথবা হঠাৎ অধিক পরিমাণ প্রস্তরখন্ড আসলে নদী তা সম্পূর্ণরূপে বহন করতে না পেরে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। এভাবে নদীবাহিত বিভিন্ন পদার্থগুলো অল্প ঢালু অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। নদী হঠাৎ উচ্চ ভূমি হতে নিম্ন ভূমিতে পতিত হলে সেখানে পলি জমা হয়ে পলল পাখা বা পলল কোণ গঠিত হয়। কখনও কখনও পাহাড়ের পাদদেশে প্রস্তরখন্ড নুড়ি, বালুকা প্রভৃতি জমা হয়ে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি করে। ভারতের শিবালিক পর্বতের পাদদেশে এরূপ সমভূমি গঠিত হতে দেখা যায়।

নদী তার অববাহিকার বিভিন্ন অংশ ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন এই তিনটি কাজ করে থঅকে। নদীর শক্তি নির্ভর করে (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির গতিবেগের ওপর।

২। **সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি (Plain or Middle Stage) :** পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে নদী যখন সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার প্রবাহকে সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর বিস্তার বেশী হয়। নদী অববাহিকা প্রশস্থ হয় ও উপত্যকাগুলোর গভীরতা কমে আসে। এই অংশে নদীর পানির পরিমাণ বেশী হয় বহু উপনদী এ অংশে এসে মূল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদী উপত্যকার গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে বর্ষাকালে নদী স্ফীত হয়ে তার দু'দিকের নিম্ন ভূমিসমূহকে বন্যায় প্লাবিত করে। নদী বাহিত পলি দ্বারা ঐ নিম্ন ভূমিসমূহ ধীরে ধীরে উঁচু হয় এবং সমভূমির আকার ধারণ করে। একে প্লাবন ভূমি বলে। এ প্রবাহে নদী ক্রমশ ধীরগতি সম্পন্ন হয় এবং বাঁধা এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে থাকে। এই পর্যায়ে বিলুনী নদীর (Broided) আধিক্য দেখা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে নদীর পার্শ্বক্ষয় বা নদীভাঙ্গন এবং অবক্ষেপন কাজ বৃদ্ধি পায়। সমভূমি অবস্থায় নদীর ক্ষয় ও পরিবহন কার্য ততো প্রবল হয় না। এ অবস্থায় নদীর সঞ্চয় কার্য শুরু হয়। গঙ্গা নদীর হরিদ্বার হতে রাজমহল পর্যন্ত অংশ এর মধ্য প্রবাহ।

৩। **ব-দ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি (Deltaic or Lower Stage) :**

নদীর শেষ অংশ বা নদীর নিম্নগতিকে ব-দ্বীব অবস্থা বলা হয়। এ সময় নদীর স্রোতের বেগ খুবই কম হয়। নদীর নিম্নক্ষয় বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বল্প পরিমাণে পার্শ্বক্ষয় হতে পারে। ফলে নদীর উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। নদীর এ অংশে স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় নদীবাহিত বালুকা, কর্দম ও পলি মোহনায় সঞ্চিত হয়ে নদীর গতি পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। নদীর গতি বাঁধা পেয়ে তা একাধিক দিক দিয়ে চলে যায়। কালক্রমে নদীমুখ এ পলি সঞ্চিত করে ভূভাগ উচ্চ হয়ে ব-এর আকার ধারণ করে ক্রিকোণাকৃতি দ্বীপের সৃষ্টি করে। এটি ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। ব-দ্বীপ গঠন ব্যতীত এ অংশে নদীর খাত পরিবর্তন, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, প্লাবন সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা নদীর নিম্নগতি রাজমহল হতে মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাঠসংক্ষেপ :

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্নঢাল অভিমুখী প্রাকৃতিক পানি প্রবাহকে নদী বলে। মূল নদী, উপনদী ও শাখা নদী একত্রে নদী অববাহিকা গড়ে তোলে। প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকা আছে যা পানি পর্যঙ্ক নামে পরিচিত। নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও ঢালু জায়গা।

নদী প্রবাহ দুই প্রকার। যেমন, পত্রবৎ প্রবাহ ও ঘূর্ণি প্রবাহ। প্রবাহ প্রাকৃতিক নদীতে খুব বেশী দেখা যায় না। নদীর প্রবাহ নিম্নোক্ত নিয়ামক দ্বারা প্রবাহিত হয়। যথা-পানির পরিমাণ, বেগ, নদী খাতের আকার ও আকৃতি, ঢাল, নদী খাতের ভিত্তি তল, পলির

পরিমাণ ও ধরন। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, যৌবন বা পার্বত্য গতি অবস্থা, সমভূমি বা মধ্যগতি এবং বদ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি।

পঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. একটি সুনির্দিষ্ট .... নিম্নঢালাভিমুখী প্রাকৃতিক পানি প্রবাহকে নদী বলে।

১.২. প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব .... এলাকা আছে।

১.৩. নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও ...... জায়গা।

১.৪. নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গতি পথকে ....ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১.৫. .... অবস্থায় নদীর ক্ষয় ও পরিবহন কার্য ততো প্রবল হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। নদী কাকে বলে?

২। পানি পর্যঙ্ক (Water Basin) কি?

৩। পানি বিভাজন বলতে কি বোঝায়?

৪। নদীর উৎপত্তির জন কি কি প্রয়োজন?

৫। একটি নদীখাতের আড় চিত্রে (Cross Profile) বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করুন ও নাম লিখুন।

৬ নদীর পত্রবৎ প্রবাহ (Laminer Flow) ও ঘুর্ণিপ্রবাহ (Turbulent Flow) বলতে কি বোঝায়।

৭। নদীর পানি প্রবাহ কি কি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত?

৮। নদীর গতিপথকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয় ও কি কি?

৯। বিভিন্ন গতিতে নদীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। নদী কি? নদীর আকৃতি প্রবাহ ও বিভিন্ন গতির বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫.৭

নদীর কাজ
Function of River

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- নদীর বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

নদী তার অববাহিকার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন- এই তিন প্রকার কার্য করে থাকে। প্রধান নদীগুলো এত দীর্ঘ হয় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নদীর এই তিনটি কাজ এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না। তবে একটি নদীর গতিপথকে তিনটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন-(ক) ধারণ অববাহিকা (Catchment Basin), (খ) নদীখাত (Channel), এবং (গ) পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখন্ড (Alluvial Cone)।

ধারণ অববাহিকায় নদী তার জলধারা এবং প্রস্তর খন্ড (Rock Waste) সমূহ সংগ্রহ করে থাকে। নদীখাত বা উপত্যকায় নদী তার উর্ধ্ব অংশের দ্রব্যসমূহ বহন করে নদীখাতকে পরিষ্কার রাখে। ক্ষুদ্র পার্বত্য জলধারা যে সকল দ্রব্য প্রধান নদীতে বহন করতে পারে না, তা নিম্ন প্রবাহে ক্রমশ: সঞ্চিত হয়ে পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখন্ড গঠন করে। নদী বা পার্বত্য জল ধারার এই তিনটি অংশ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি অংশ অপর একটি অংশের উপর নির্ভরশীল।

নদীর গতিপথে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন কার্যের জন্য শক্তির প্রয়োজন। নদীর শক্তি নির্ভর করে তার (১) পানির পরিমাণ (Volume) ও (২) পানির গতিবেগের (Velocity) ওপর। এই দুটিকে একত্রে নদীর প্রবাহ (Discharge) বলে। নদীর এই শক্তি নদীখাত ও নদীতীর ঘর্ষণে ও ক্ষয়কার্যে, বিভিন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্য বহনে এবং অবক্ষেপনে ব্যবহৃত হয়।

নদীর ক্ষয়সাধন (River Erosion) :

নদীর ক্ষয়কার্য প্রধানতঃ চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, (১) পানি প্রবাহ জনিত ক্ষয় (Hydraulic Action), (২) অবঘর্ষ ক্ষয় (Corrasion), (৩) ঘর্ষণজনিতক্ষয় (Attrition) ও (৪) দ্রবণ (Solution)। নদীর এসকল ক্ষয় ক্রিয়া তিন উপায়ে সম্পাদিত হয়। যথা-(ক) পশ্চাৎমুখী ক্ষয় সাধন, (খ) তলদেশ ক্ষয় সাধন ও (গ) পার্শ্বক্ষয়।

(ক) পানি প্রবাহ ক্ষয় (Hydraulic Action) : প্রবহমান নদীর পানি নদীখাত ও নদীপার্শ্ব প্রচন্ড বেগে আঘাত করলে অপেক্ষাকৃত কোমল ও অসংলগ্ন প্রস্তর খন্ডগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং নদীর স্রোতের সঙ্গে বহু দূরে নীত হয়। একে পানি প্রবাহ ক্ষয় বলে।

(খ) অবঘর্ষ (Abrrasion) : নদী খাতের সঙ্গে নদীবাহিত প্রস্তর খন্ডের সংঘর্ষের ফলেও নদী ক্ষয়সাধন করে। নদী বাহিত প্রস্তরখন্ডগুলো নদীর স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে চলে এবং নদীখাতের তলদেশে জমা হয়।

(গ) ঘর্ষণজনিতক্ষয় (Attrition) : নদীবাহিত প্রস্তরখন্ড (Boulders) একটি অপরটির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডে এবং অবশেষে বালুকণায় পরিণত হয়। ফলে নদী অতি সহজেই এগুলো বহন করতে পারে।

(ঘ) দ্রবণ ক্ষয় বা অবক্ষয় (Solution or Corrosion) : নদীর পানিতে অনেক সমরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তরখন্ড দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চুনাপাথর অঞ্চলে এ প্রকার ক্ষয়কার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একে দ্রবণ বলা হয়।

উপরোক্ত চার প্রক্রিয়া একত্রে একটি নদীর ক্ষয়কাজ সম্পন্ন করে। নদীর এ সমস্ত ক্ষয় প্রক্রিয়া তিন উপায়ে সম্পাদিত হয়। যথা,

ক) পশ্চাদনদী ক্ষয়সাধন (Headward Erosion)

খ) তলদেশ, ক্ষয়সাধন (Bed Cutting), এবং

গ) পার্শ্বক্ষয় (Lateral Erosion)

পশ্চাদনদী ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে নদী তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। ভূগর্ভস্থ বা অন্তঃপ্রবাহের কারণে পাহাড়ের গায়ে যে ঝর্ণার সৃষ্টি হয় তা নদীর একটি অংশ। ঝর্ণার উৎস অঞ্চল ক্রমাগত ক্ষয় সাধারনের কারণে দৈর্ঘ্য ওপরের দিকে বাড়তে থাকে। নদীর নিম্নগামী ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে তলদেশের গভীরতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া নদীর পার্শ্বক্ষয়ও নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পদ্ধতিতে নদী তার এক পাড়ে ক্ষয়সাধন করে এবং বিপরীত পাড়ে এ ক্ষয়িত শিলা/পলিমাটি সঞ্চয় করে থাকে।

নদীর পরিবহন কাজ (Transport Work of a River) :

নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে যায় বাকী অংশ শুধু পরিবহন কাজে ব্যয় হয়। যে কোন বৃহৎ নদী প্রস্তর খন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার ভার (Load) রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে :

১) দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন (Solution Process) প্রক্রিয়া,

২) ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension Process) প্রক্রিয়া,

৩) লম্ফদান প্রক্রিয়া (Sallation Process),

৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন (Attraction Process)

নিম্নে নদীর পরিবহণ কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

১। দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবহন : নদী তার গতিপথে অনেক সময় কোনো কোনো প্রস্তর খন্ডকে পানির সাথে দ্রবীভূত করে তা পানি স্রোতের সঙ্গে বহন করে থাকে। চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন করে থাকে। নদীর দ্রবীভূত বোঝার (Dissolved load) পরিমাণে খুব তারতম্য হয়। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। পৃথিবীর প্রধান নদীসমূহের গড় দ্রবীভূত বোঝার পরিমাণ ১১৫ পি.পি.এস থেকে ১২০ পি.পি.এস.। প্রতি বছর এ সমস্ত নদী থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) মেট্রিক টন দ্রবীভূত পদার্থ সমুদ্রে পতিত হয়।

২। ভাসমান অবস্থায় বহন প্রক্রিয়া (Suspension Process) : বেশিরভাগ নদীর মোট বাহিত পদার্থের প্রধান অংশ হলো ভাসমান পদার্থ সমূহ। নদীর ঘোলা পানি থেকে সহজেই ভাসমান বোঝার (Suspended Load) ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভাসমান বোঝার প্রধান অংশ মূলত বালি, পলি ও কর্দম আকৃতির পদার্থে গঠিত। অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখন্ড নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যায়।

৩. লম্ফদান প্রক্রিয়া (Sallation Process) : তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার প্রস্তরখন্ডগুলো লম্ফদান করতে করতে একবার নদীর তলদেশে (Bed) ঠেকে পুনরায় লম্বদান করে ওপরে। একে লম্ফ প্রক্রিয়ায় (Saltation Process) বহন প্রক্রিয়া ভেসে আসে বলা হয়।

৪. আকর্ষণ বা টানের মধ্যমে বহন প্রক্রিয়া বড় আকৃতির পদার্থ বোল্ডার থাকতে পারে যা ভাসমান অবস্থায় যেমনঃ বহন করা সম্ভব হয় না। এ ধরণের ভারী ও বড় পদার্থসমূহ নদীর তলদেশীয় ভার (Bed Load) বলে। নদী-বাহিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে বাহিত হয় বলে একে নদী গর্ভ ভার (Bed Load) বা টন বা আকর্ষক ভার বলা (Traction Load) হয়। এই টান বা আকর্ষণের দ্বারাও নদী বহন করে থাকে। ধারণা করা হয়, নদীর তলদেশীয় ভার মোট ভারের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হয় না।

নদীর বহন করার ক্ষমতা নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন-(ক) নদীতে পানি কমে গেলে, (খ) নদী-ঢালের পরিবর্তন হলে, (গ) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ প্রস্তরখন্ড বা ভার (Load) নদীতে আসলে, এবং (ঘ) নদী কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে। এরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু প্রস্তরখন্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার প্রস্তরগুলো নদীর উচ্চ প্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর খন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্ন প্রবাহে অর্থাৎ মোহনার নিকট জমা হয়। একে নদীর অবক্ষেপন (Deposition) বলে।

নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহের ওপর নদীর ক্ষয়কার্য নির্ভরশীল :

১। জলবায়ু : নদীর ক্ষয়কার্যের ওপর নদীর গতিবেগের প্রভাব অধিক, কিন্তু নদীর গতিবেগ আবার প্রবল বারিপাতের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য জলবায়ু নদীর ক্ষয়কার্যকে পরিচালিত করে।

২. নদীগর্ভের শিলার উপাদান : নদীগর্ভ কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হলে নদীর ক্ষয়কার্য প্রবল হয়। কিন্তু কঠিন শিলা অংশে ক্ষয় খুবই কম হয়ে থাকে।

৩. বাহিত শিলার কাঠিন্য : নদীবাহিত পদার্থগুলো অধিক কঠিন হলে নদীর ক্ষয়কার্য বেশী হয়। কিন্তু পদার্থগুলো নরম হলে সহজেই গলে যায় এবং ক্ষয়কার্য খুবই কম হয়।

৪. নদীর পানির গলানো শক্তি : অনেক সময় নদীর পানির কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় নদীর ক্ষয়কার্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৫. নদীগর্ভে ফাটল ও সন্ধির অবস্থান : নদীগর্ভে বহু ফাটল (Cracks) ও সন্ধি (Joints) থাকলে তাদে ভেতর পানি প্রবেশ করে এবং শেষে নদীগর্ভের এক বিরাট অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

পাঠসংক্ষেপ :

নদী তার অববাহিকার বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন এই তিনটি কার্য করে থাকে। নদীর শক্তি নির্ভর করে (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির গতিবেগের ওপর। এই দুটিকে একত্রে নদীর প্রবাহ বলে। নদী তার ভার চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন, (১) দ্রবন প্রক্রিয়ায়, (২) ভাসমান অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন, ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন। নদীর ক্ষয়কার্য বিভিন্ন নিয়ামকসমূহের ওপর নির্ভর করে। যেমন, জলবায়ু, নদীগর্ভে শিলার উপাদান, বাহিত শিলার কাঠিন্য, নদীর পানি গলানোর শক্তি, নদীগর্ভে ফাটল ও সন্ধির অবস্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. **শূন্যস্থান পূরন করুন :**

১.১. নদী তার অববাহিকার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও .... এই তিন প্রকার কার্য করে থাকে।

১.২. নদীর শক্তি নির্ভর করে তার (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির ......ওপর।

১.৩. নদীর ক্ষয়কার্য প্রধানত: চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, (১) পানি প্রবাহ ক্ষয়, (২) .... (৩) ঘর্ষণজনিতক্ষয় ও (৪) দ্রবণ।

১.৪. নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ....ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে যায়।

১.৫. নদী তার ভার চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন, (১) দ্রবন প্রক্রিয়ায়, (২) .... বহন (৩) লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন, ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নদী কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও কিভাবে ক্ষয়সাধন করে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. নদী তার ভার কি কি প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে সে বিষয়ে বর্ণনা দিন।

৩. নদীর বহন করার ক্ষমতা কি কি কারণে পরিবর্তিত হতে পারে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. নদী কি? নদীর আকৃতি, প্রবাহ ও বিভিন্ন গতির বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.৮

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
Erosional Features of River

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য অত্যন্ত বেশী। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি এবং প্রবল গতিবেগের জন্য স্রোতে ক্ষয়সাধনের ক্ষমতা এ অংশে সর্বাংশে অধিক। সমভূমি অবস্থায় নদীর ক্ষয়সাধন কম এবং শেষ অবস্থায় ক্ষয়সাধন প্রায় বন্ধ থাকে। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর কার্যাবলীর তারতম্যের কারণে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গড়ে উঠে। নিম্নে নদীর উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন অংশে গড়ে উঠা ভূমিরূপের বিবরণ দেয়া হলো।

১। নদীর উর্ধ্ব অঞ্চলের ভূমিরূপ (Land Forms in the Upper or Young Stage) :

(i) নদী উপত্যকা (River Valley) : পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয় ক্রিয়াই সর্বাধিক। পর্বত থেকে প্রবল বেগে নামার সময় নদীর প্রবল স্রোত বড় বড় শিলা খন্ড বহন করে নিম্নদিকে অগ্রসর হয়। এখানে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশী হয়। এরূপে ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজী 'ভি' (V) অক্ষরের মত হয়। ফলে এরূপ উপত্যকাকে ভি-আকৃতি উপত্যকা (V-shaped Valley) বলা হয় (চিত্র-৫.৮.১)। কিন্তু নদীর মধ্য গতিতে অর্থাৎ সমভূমি অবস্থায় উপত্যকার আকৃতির পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় স্রোত ও শিলারাশি দ্বারা উল্লম্ব (Vertical) ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশী হয়। ফলে নদী ক্রমশ প্রশস্থ হয়ে কোনো কোনো স্থানে ইংরেজি 'ইউ' (U) আকৃতি বা চ্যাপটা প্রশস্ত আকৃতি ধারণ করে। নদী যতই মোহনার দিকে অগ্রসর হয়, ততোই এর উপত্যকার বিস্তৃতি ঘটে।

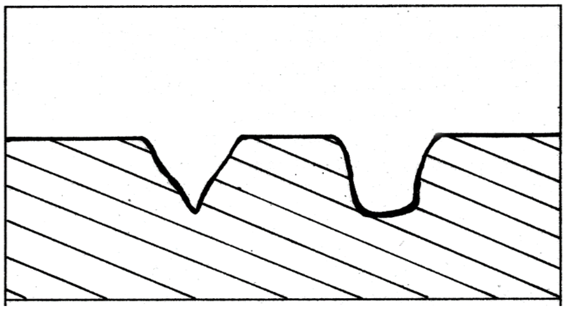

চিত্র : ৫.৮.১ : V ও U আকৃতির উপত্তকা

চিত্র : ৫.৮.২ : গিরিখাত

(ii) **গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (George and Canyon) :**

প্রাথমিক গতিতে নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বত গাত্র বেয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষয় হয় এবং ভূত্বক থেকে শিলাখন্ড ভেঙ্গে পড়ে। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের দরুন শিলাখন্ডগুলো মসৃণ ও ক্ষুদ্রতর হয়ে পানির সাথে বহুদুরে চলে যায়। এ সকল পাথরের ঘর্ষণে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দু-পার্শ্বের শিলা যদি ক্ষয় না হয় তাহলে এ সকল খাত খুব গভীর হয়। তখন এ সকল খাতকে গিরিখাত (George) বলে (চিত্র-৫.৮.২)। সিন্ধু নদের গিরিখাত, আফগানিস্থানে কাবুল নদীর গিরিখাত, ভারতের অরুণাচলে ব্রক্ষপুত্র নদীর গিরিখাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গিরিখাতগুলো শুষ্ক কোমল শিলা স্তরে হলে অতীব সংকীর্ণ ও গভীর হয়। ফলে নদীর উভয় পার্শ্ব অধিক উচ্চ ও খাড়া হয়।

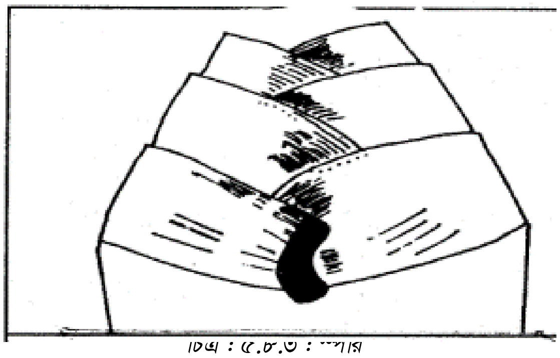

চিত্র : ৫.৮.৩ : স্পার

এরূপ গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন (Canyon) বলে। উত্তর আমেরিকার কলরাডো নদীর গিরিখাত-গ্রান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবীর বিখ্যাত। এ গিরিখাত ১৩৭ থেকে ৪৫৭ মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় ২.৪ কি.মি গভীর ও ৪৮২ কি.মি দীর্ঘ।

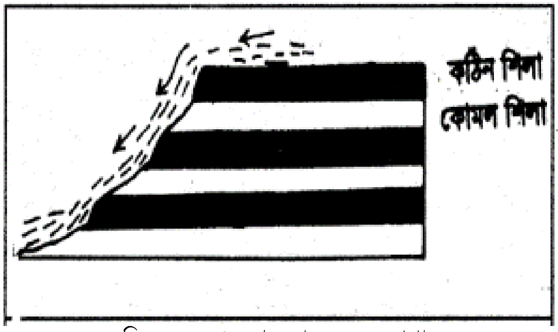

চিত্র : ৫.৮.৪ : খরস্রোত ও জলপ্রপাত

(iii) **স্পার (Spur) :** উৎস থেকে নিম্ন ঢালে যাওয়ার পথে নদী এক পাড় থেকে অন্য পাড় বদল করে অগ্রসর হয়। অবশ্য এ অবস্থায়ও এর তলদেশের ক্ষয়কাজ ঠিকই চলতে থাকে। নদীর এ ধরনের গতি ধারার ফলে পাহাড়ের গাত্রসমূহ ঠিক দুটি করাত মুখোমুখি রাখলে দাঁতসমূহ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে। তেমনি ভাবে পাহাড়ের পার্শ্ব দেশসমূহ পরস্পরের দিকে ঝুঁকে থাকা ভূমিরূপ গড়ে তোলে। এ ধরনের ভূমিরূপকে স্পার বলে (চিত্র-৫.৮.৩)।

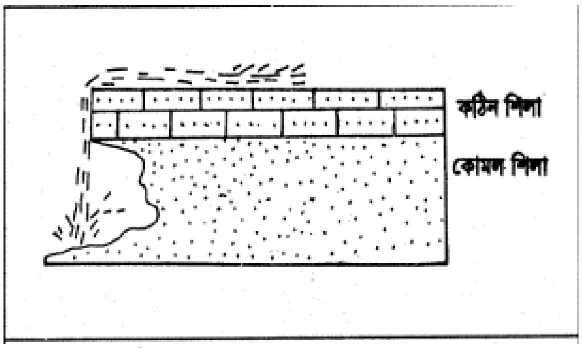

চিত্র : ৫.৮.৫ : খরস্রোত ও জলপ্রপাত

(iv) **র‌্যাপিডস্ ও কাসকেড (Rapids and Cascades) :**

পাহাড়ী খাড়া ঢালের ক্ষয় স্রোতকেই 'র‍্যাপিডস' বলে। অনেক সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদী স্রোত নিচে চলতে থাকে। এরূপ ঢালু জায়গায় মাটি পর্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল থাকতে পারে। ফলে নদীর স্রোতে নরম মাটি অল্প অল্প করে ক্ষয় হয় এবং ছোট ছোট জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়। এ জল প্রপাতগুলো সারিবদ্ধভাবে ওপর থেকে নিচের দিকে অবস্থান করে এবং নদীস্রোত লাফাতে লাফাতে নিচে পড়তে থাকে। এরূপ প্রবহমান স্রোতকে বা সারিবদ্ধভাবে সৃষ্ট ছোট ছোট জল প্রপাতকে খরস্রোত বা র‍্যাপিডস (Rapids) বলে (চিত্র-৫.৮.৪)। এ অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র জল প্রপাতকে কাসকেড (Cascades) বলে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রপাতগুলো বেশী দিন স্থায়ী হয় না। মিসরের নীল নদের গতিপথে কাসকেড দেখা যায়। বাংলাদেশে বান্দরবান এর পাহাড়ী নদীতে এবং ভারতের মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে এরূপ ভূমিরূপ দেখা যায়।

(v) **জলপ্রপাত (Water Tall) :**

জলপ্রপাত বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন, পানি খাড়াভাবে একটি স্রস্ত উপত্যকার ওপর অথবা হিমবাহ উপত্যকায় পতিত হলে এ ধরনের জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়। বেশীর ভাগ জল প্রপাতের ওপরে কঠিন শিলা এবং নিচে কোমল শিলা স্তর দেখা যায় (চিত্র-৫.৮.৫)। পার্বত্য অবস্থায় নদীস্রোত কোনো কঠিন শিলাস্তর হতে কোমল শিলা স্তরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কোমল শিলা স্তরটিকে বেশী পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। ফলে কঠিন শিলা স্তর কোমল শিলাস্তর অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থান করে এবং পানি ধারা খাড়াভাবে নিচে পড়তে থাকে। পানির এইরূপ পতনকে জলপ্রপাত (Waterfall) বলে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে নয়াস্ত একটি অতিকায় বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

নদী এভাবে কোমল শিলাস্তর ভেতরের দিকে ক্ষয় করতে থাকে। এক পর্যায়ে কঠিন শিলার তলদেশের সমস্ত শিলা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় তা ওপর থেকে ঝুলতে থাকে। অবশেষে ঝুলতে ঝুলতে কঠিন শিলাস্তর ভেঙ্গে পড়ে এবং জলপ্রপাত পশ্চাদপসরণ করে।

(vi) **বর্তুলাকার গর্ত (Pot Holes) :** র‍্যাপিডস বা জলপ্রপাতের পাদদেশে নদীর পানিতে স্থানীয়ভাবে অনেক আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই অংশে নদীর পানি পাক খেয়ে খেয়ে আবর্তিত হতে থাকে বলে নদী মধ্যস্থিত শিলাচূর্ণের ঘর্ষণে নদীগর্ভের শিলার গোলাকৃতি গর্তের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে বর্তুলাকার গর্ত বলে। পর্বত বা মালভূমির উভয় অংশেই এরূপ বর্তুলাকার গর্ত দেখা যায় (চিত্র-৫.৮.৬)।

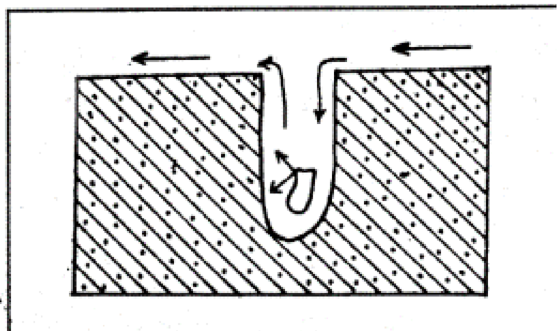

চিত্র- ৫. ৮. ৬ বর্তুলাকার গর্ত

(vi) নদী বাঁক (Meander), ব্লাফস (Bluffs) ও বাঁকের চর (Slip-off Slopes, Point Bar):

নদীর সব গতিতেই বাঁক দেখা যায় এবং উর্দ্ধ গতিতে এ ধরনের বাঁক তুলনামূলকভাবে কম। নদী প্রবাহ বাঁক ঘূরার সময় কেন্দ্রাভিগ বলের কারণে বাইরের দিকে ঝুঁকে গিয়ে পাড়ে আঘাত করে। ফলে, পাড়ের ভিত্তি তল ক্ষয় সাধিত হয় এবং এক পর্যায়ে তা সহজে ধসে পড়ে। তখন

নদী পাড় প্রায় খাড়াভাবে অবস্থান করে। এ ধরনের ভূমিরূপকেই ব্লাফ বলে। বাঁকের ভেতর পাড় বরাবর স্রোতের শক্তি কম থাকায় পলি সহজেই জমা হয়ে স্বল্প ঢাল বিশিষ্ট চরার সৃষ্টি করে তাকে বাঁকের চর বলে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি নদীর সঞ্চয় কাজের ফল হলেও উজানে ক্ষয়কাজের পরিণতি।

২। নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভূমিরূপ (Land Froms in the Middle Stage) :

কিছু কিছু ভূমিরূপ যা নদীর উর্ধ্বাঞ্চলে দেখা গেছে তা মধ্যবর্তী অঞ্চলেও দেখা যায়। যেমন, কিছু র‍্যাপিডস, জলপ্রপাত, নদী বাঁক ও ব্লাফস। এ ধরনের ভূমিরূপ তুলনামূলকভাবে কম হলেও এর কিছু কিছু নমুনা দেখা যায়। নদী বাঁক এ অংশে আরও অনেক প্রশস্ত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশস্ত 'ভি' আকৃতির উপত্যকা ও সংকীর্ণ প্লাবনভূমি পাহাড়ী অংশের নদীখাতের চেয়ে এ অংশের খাত অনেক প্রশস্ত এবং স্পারসমূহ অনুপস্থিত। নদী নিজেই এ সকল স্পার ক্ষয় করে উপত্যকার আয়তন বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া, এ অংশের শেষ পর্যায়ে নদীর উভয় পাড় উপচে পার্শ্ববর্তী নিম্ন অংশে পলি সঞ্চয় করে প্লাবন ভূমি গড়ে তোলে। একাধিক নদী বাঁকের অবস্থান থাকলে নদীটিকে সর্পিল (Meandering River) বলা যাবে।

(i) প্লাবন ভূমি (Flood Plain) :

প্রাথমিক ভূমির অনিয়মতার জন্য সর্বদাই নদীর কোনো কোনো স্থান বাঁকের সৃষ্টি হয়। এ বাঁকের বহিঃ প্রান্তদেশে নদীর জলস্রোত সরাসরি আঘাত করে ও এর সঙ্গে পাড়ের ক্ষয়ও সংযুক্ত হয়। ফলে এ অংশে নদীর ক্ষয়কার্য বেশী হয় ও বাঁকের বক্রতা বাড়তে থাকে। স্বভাবতই এ অংশে নদী যে ভূমি পরিত্যাগ করে এসেছে সেই অংশে ঢাল মৃদু হয় এবং বাঁকের বহিঃ প্রান্তদেশের ঢাল খাড়া হয়। ফলে নদীর পার্শ্বদেশে অপ্রতিসম ঢালের সৃষ্টি হয়। যে ঢাল বরাবর নদী বাঁক নেবার সময় অগ্রসর হয় তাকে। পরিত্যক্ত নদী বাঁক ঢাল (Slip-offslope) বলে। অপরপক্ষে, নদী বাঁকের বহিঃপ্রান্তদেশের খাড়া ঢালকে নিম্নকর্তিত ঢাল (Under-cut Slope) বলে। এভাবে ঢালের একদিকে প্রায় সমতল বা সামান্য ঢালযুক্ত ভূমির সৃষ্টি হয়। প্লাবনের সময় এর ওপর পানির অনুপ্রবেশ ঘটে ও পানির বয়ে আনা পলি ভূমির ওপর থিতিয়ে পলির এক আস্তরণ ফেলে। এর ফলে ঐ প্রায় সমভূমি আরও মসৃণ হয়ে ওঠে। একেই প্লাবন ভূমি বলে (চিত্র-৫.৮.৭)।

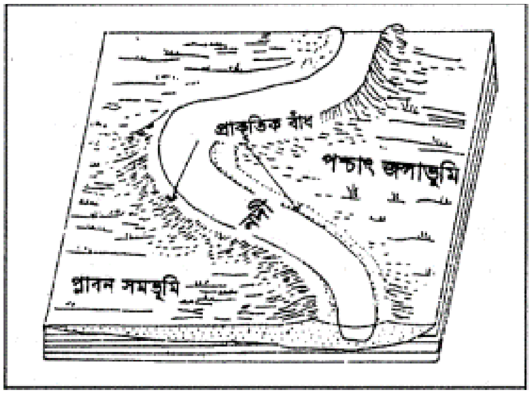

চিত্র : ৫.৮.৭ : প্লাবন সমভূমি ও প্রাকৃতিক বাঁধ

(ii) খোদিত নদী বাঁক (Incised Meander) :

নদীর পুনঃ যৌবন প্রাপ্তি ঘটলে নদীর নিম্নক্ষয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ভূমি উজানের ফলে নদীর বাঁক কেটে বসে যায় ও দুপাড় খাড়া থাকে। খোদিত নদী বাঁকের ক্ষেত্রে নদীর তল পূর্বেকার প্লাবন ভূমির অনেক নিম্নে থাকে এবং প্লাবন পানি কখনোই অংশে উত্থিত হতে পারে না। স্বভাবতই এ অবস্থা নদীর বর্ধিত নিম্নক্ষয় বা নদীর পুনঃযৌবন প্রাপ্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। অপরপক্ষে, অসম পাড় বিশিষ্ট খোদিত বাঁকের (Ingrown Meander) ক্ষেত্রে নদীর নিম্নক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম প্রবল থাকে। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নক্ষয়ের

সঙ্গে সঙ্গে নদী পার্শ্বদেশেও কিছুটা সরতে থাকে। ফলে নদী বাঁকের উভয় পার্শ্বের ভূমির উচ্চতা একই প্রকার থাকে না। পরবর্তীকালে প্লাবন সমভূমিতে, যেমন, পরিত্যক্ত নদীবাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়, তেমন অসম পাড় খোদিত নদীর বাঁকের ক্ষেত্রেও একই ভাবে এরূপ হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। একে বিচ্ছিন্ন নদী বাঁক (Meander Cut Off) বলে।

(iii) নদী মঞ্চ (River Terrace) :

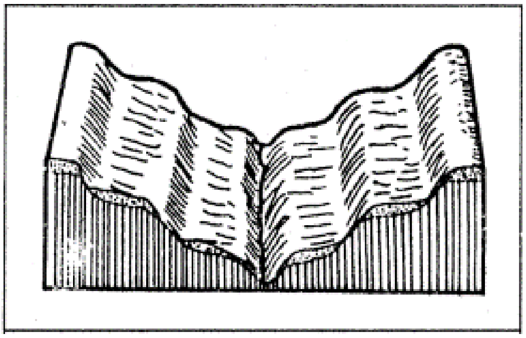

চিত্র : ৫.৮.৮ : নদী মঞ্চ

নদীর উভয় পর্শ্বে অনেক সময় এক বা একাধিক ধাপ বা মঞ্চ দেখা যায়। এ মঞ্চ পূর্ণযৌবন লাভের পূর্ববর্তীকালের নদী উপত্যকার তলদেশের সমতল প্লাবন ভূমিকে উপস্থাপিত করে। পূর্ণযৌবন প্রাপ্তির ফলে নদী নিচে কেটে বসে যায় বলে পূর্বেকার নদী উপত্যকার সমতল মেঝে (প্লাবন ভূমি) নদীর দুই পাশে কিছুটা উর্ধ্বে মঞ্চের আকার বিরাজ করে। সিঁড়ির ন্যায় অবস্থিত এ ধাপগুলোকে নদীমঞ্চ বা নদী সোপান (চিত্র-৫.৮.৮) বলা হয়। নদীর উচ্চ ও মধ্যগতিতে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়। নদীর পূর্ণযৌবন লাভ ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে নদীর পানির উর্ধ্ব সমীনার পরিবর্তন ঘটলেও নদীমঞ্চের সৃষ্টি হয়। ব্রক্ষপুত্র, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি নদীর গতিপথে এরূপ নদীমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণত দুই প্রকারের নদীমঞ্চ দেখা যায়। যেমন, (১) শিলা মঞ্চ, ও (২) পলল মঞ্চ। নদীর সমতল উপত্যকায় যদি পলির গভীরতা কম হয়ে থাকে, তবে আদি শিলা ক্ষয় হলে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় মঞ্চকে শিলা-মঞ্চ (Rock Terrace) বলে। আবার পুরু পলল স্তর দ্বারা গঠিত সমতল উপত্যকার ওপর নদী পূর্ব প্রক্রিয়ায় পূর্ণযৌবন লাভের মাধ্যমে নদী মঞ্চের সৃষ্টি করলে এ জাতীয় মঞ্চকে পলল মঞ্চ (Alluvial Terrace) বলা হয়।

ক্ষয়চক্র (Cycle of Erosion) :

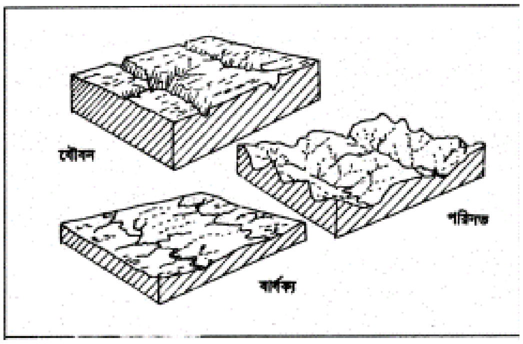

চিত্র : ৫.৮.৯: ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূমি পরিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা

নদীর বিভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে নদীটি খুবই খরস্রোতা ও ঢালযুক্ত হয়। উপনদী ও শাখা নদীর সংখ্যা খুবই কম থাকে। নদীর ক্ষয় সাধনই এ পর্যায়ের প্রধান কাজ। পরিণত অবস্থায় নদীর উপনদী ও শাখা নদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নদীর ঢাল ক্রমেই হ্রাস পায়। নদী বড় বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এবং নদী সৃষ্ট প্লাবন ভূমিতে এ বাঁকগুলো স্থান পরিবর্তন করে। পরবর্তী পর্যায়ে বার্ধক্য অবস্থায় নদীর ঢাল আরও হ্রাস পায় এবং নদীর মধ্যে ও পাড়ে নদীবাহিত তলানির সঞ্চয় ঘটে। নদী অগভীর ও অস্বাভাবিক প্রশস্থতা লাভ করে (চিত্র-৫.৮.৯)। নদীর পার্বত্য গতির যৌবন অবস্থা থেকে বার্ধক্য অবস্থায় এসে পরিণতি লাভ করাকে ক্ষয় চক্র নামে

অভিহিত করেন। আমেরিকান ভূ-বিজ্ঞানী এম ডেভিস প্রথম ক্ষয়চক্র ধারণা প্রবর্তন করেন। তার বর্ণিত ক্ষয়চক্রে প্রক্রিয়া ভূমিরূপের বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নদী দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলে যে ক্ষয়চক্রের ধারা নির্দিষ্ট হয় তাকে নদী ক্ষয়চক্র বা স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলে। নদী পার্বত্য অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থা এবং শেষে বার্ধক্য অবস্থায় পৌঁছার পরে আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদীর প্রাথমিক গতিতে ফিরে যাওয়াকে নদীর পুনঃযৌবন (Rejuvination) বলে।

পাঠসংক্ষেপ :

নদীর যৌবনাবস্থায় উর্ধ্বগতিতে ক্ষয়কার্য সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হলো 'V'ও'U' আকৃতির উপত্যকা, গিরিখাত ও ক্যানিয়ন, স্পার, র‍্যাপিডস ও কাসকেডস, জলপ্রপাত, বর্তুলাকার গর্ত, নদীবাঁক, ইত্যাদি। নদীর মধ্যম পর্যায়ের ক্ষয়জাত ভূমিরূপের মধ্যে খোদিত নদী বাঁক, নদী মঞ্চ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূন্যস্থানপূরণ করুন:

১.১. পার্বত্য অবস্থার নদীর ....ক্রিয়াই সর্বাধিক।

১.২. .... থেকে নিম্ন ঢালে যাওয়ার পথে নদী এক পাড় থেকে অন্য পাড়, এভাবে পাড় বদল করে অগ্রসর হয়।

১.৩. পার্বত্য অবস্থায় নদীস্রোত কোনো কঠিন শিলাস্তর হতে কোমল শিলা স্তরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে .... শিলা স্তরটিকে বেশী পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে।

১.৪. র‍্যাপিডস বা জলপ্রপাতের পাদদেশে নদীর পানিতে স্থানীয় ভাবে অনেক ....সৃষ্টি হয়।

১.৫. প্রাথমিক ভূমির .... জন্য সর্বদাই নদীর কোনো কোনো স্থানে বাঁকের সৃষ্টি হয়।

১.৬. আমেরিকান ভূ-বিজ্ঞানী এম, ডেভিস প্রথম ...... ধারণা ভূমিরূপের বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

১.৭. নদী তার ভার চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন- (১) দ্রবণ প্রক্রিয়ায়, (২) ....অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নদীর প্রাথমিক গতিতে কি কি ধরণের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

২. নদীর মধ্য ও নিম্ন গতিতে কি প্রকারের ভূমিরূপ গঠিত হয়।

৩. স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বিভিন্ন গতিতে নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫.৯

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
Depositional Features of River

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের সাথে পরিচিত হবেন।
- বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ উদ্ভবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবেন।

সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদীর নিম্নগতি। এ সময় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। ফলে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদীস্রোতের দ্বারা বহিত হয়ে নদীগর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে নদীতীর প্রায়ই ক্ষয় হয়ে যায় এবং অত্যন্ত বিস্তৃত প্লাবন ভূমি গড়ে ওঠে। নদী এ বিস্তৃত প্লাবন ভূমি, নদী বাঁক, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী, ব-দ্বীপ অন্যতম।
পরবর্তী অংশে নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সমূহ :

পলল পাখা (Alluvial Fan) : পর্বত বা পাহাড়ী অংশ থেকে নদী সমতল ভূমিতে নেমে আসার ফলে ঢাল দ্রুত কমে যায়। এ অবস্থায় নদীর পক্ষে নদীর পানিতে বাহিত বিভিন্ন ধরনের

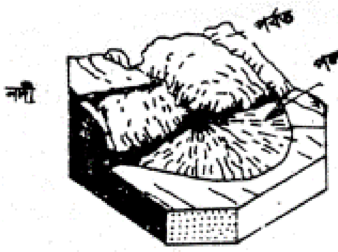

চিত্র ৫.৯.১: পলল পাখা

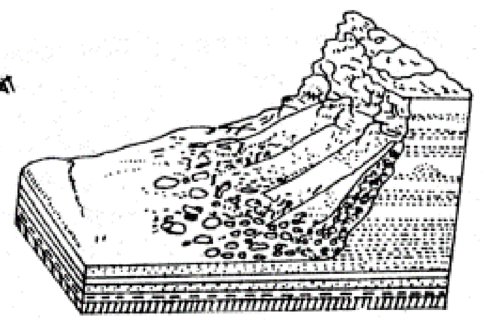

চিত্র ৫.৯.২ : পলল কোণ

পদার্থের বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে তা পাদদেশের নদী খাতেই সঞ্চয় করে। এক পর্যায়ে নদী তার এ বোঝা এড়িয়ে নতুন পথে নিম্ন অঞ্চলে অগ্রসর হয়। এভাবে নদী পাহাড়ের পাদদেশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে স্থান পরিবর্তন করে এবং অবশেষে তা পাখার ন্যায় ঢালু ভূমিরূপ গড়ে তোলে। এ ধরণের ভূমিরূপ ব-দ্বীপের মতো দেখতে হলেও এর উৎপত্তি ও গঠন কাঠামোগত দিক থেকে আলাদা। ব-দ্বীপের ক্ষেত্রে নদীপ্রবাহ সমুদ্রতল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পলি মোটা মোটা, বড় বড় শিলা টুকরো এবং বাছাইকৃত বালি ও নুড়ি পাথরই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যে সকল অঞ্চলে মাটি অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে, সে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ ((Alluvial Cone) বলে (চিত্র-৫.৯.১)। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে মৃত্তিকা কঠিন হলে নদী সঞ্চয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে হাত পাখার ন্যায় ভূ-খন্ডের সৃষ্টি করে। এরূপ পলল ভূমিকে পলল পাখা (Alluvial Fan) বলা হয়

পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Pidmont Alluvial Plain) : অনেক সময় পাহাড়িয়া নদী দ্বারা পলি সঞ্চিত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নতুন সমভূমি গড়ে ওঠে। এরূপ সমভূমিকে পাহাড়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার উত্তরভাগে অধিকাংশ স্থানই পাদদেশীয় পলল সমভূমি নামে পরিচিত। তিস্তা, আত্রাই, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদী দ্বারা এ অঞ্চল বিধৌত। এসব নদী হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে নদীগুলো সহজেই পাহাড় হতে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দুই বা ততোধিক পলল পাখা বা কোণ মিলিত হয়েও পাদদেশীয় পলল সমভূমি গঠন করতে পারে।

প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) : অধিকাংশ নদী তার নিম্ন প্রবাহে সুক্শ কর্দম, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত করে থাকে। বন্যার সময় বা প্লাবনে নদী দু'কূল ভাসিয়ে পানিতে ডুবে যায় এবং তাতে নতুন পলি সঞ্চিত হয়। এরূপ নদীর নিম্নাংশে বা মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে এক প্লাবন সমভূমির (Flood Plain) সৃষ্টি করে। গঙ্গা, পদ্মা নীল, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় এরূপ প্লাবন সমভূমি রয়েছে। প্লাবন সমভূমিতে স্বাভাবিক বাঁধ, পশ্চাৎ জলাভূমি, নদীর বাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, বালুচর প্রভৃতি ভূমিরূপ দেখা যায় (চিত্র-৫.৯.৩)।

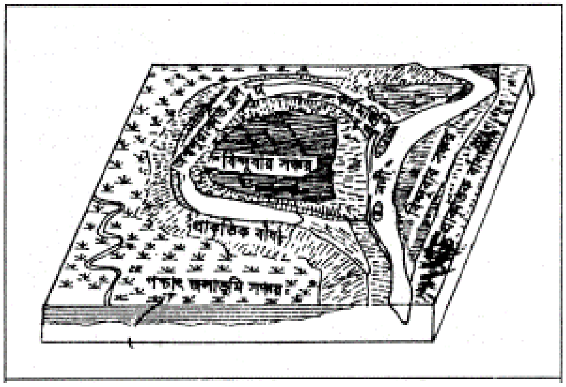

চিত্র ৫.৯.৩ : প্লাবন সমভূমিতে প্রাকৃতিক বাঁধ, কর্দম ছিপি ও পশ্চাৎ জলাভূমি দেখানো হয়েছে

প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural Levee) : প্লাবন ভূমিতে নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক বাঁধ লক্ষ্য করা যায় (চিত্র-৫.৯.৩)। নদীর নিকটবর্তী এলাকায় এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশী হয় এবং পিছনের দিকে এটি ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। এটা দুই কিলোমিটার বা তারও বেশী চওড়া হতে পারে। প্লাবনের সময় নদীর পরিবহন ক্ষমতার বৃদ্ধি এ স্বাভাবিক বাঁধের উৎপত্তির প্রধান কারণ। প্লাবনের সময় নদীর দুকূল ছাপিয়ে পানি যখন পার্শ্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন উর্ধ্ব ঢালের দিকে পানি প্রবাহ থাকে বলে পানি মধ্যস্থিত পলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশী ও যতদূর যাওয়া যায় ততোই কম সঞ্চিত হয়। বারংবার প্লাবনের ফলে এরূপ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধের আকার ধারণ করে ও প্লাবন ভূমিতে এক বিশেষ ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।

নদী গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী নদী প্রাকৃতিক বাঁধ প্লাবন সমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক্ষয়ের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। প্রায়শঃ প্লাবনের সময় নদী স্বাভাবিকভাবে কতগুলো অগভীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়। এগুলোকে প্লাবন ভূমি কর্তিত পথ (Flood Plain Scour Soute) বলে। এরা পুরোনো নদীখাতকে বা নতুন নদীখাত সৃষ্টির সূচনাকে তরান্বিত করে।

পশ্চাৎ জলাভূমি (Back Swamp) : নদী প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে প্লাবন পর্যাঙ্কে পশ্চাৎ জলাভূমির সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। পলি ও কাদা দিয়ে এ সুবিস্তৃত সঞ্চয় গঠিত হয়। পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় এলাকায় বন্ধুরতা খুবই কম। সধারণত দুই মিটারেরও কম থাকে। এ এলাকায় প্রাচীন নদী উপত্যকার অংশ বিশেষ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে পৌনঃপুনিক প্লাবনের ফলে এই চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাৎ দিকে নদীর পলি সঞ্চয় ক্রমশ কম হওয়ায় তা নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পরে বন্যার পানি সরে গেলে এ নিম্নভূমিতে জল আবদ্ধ অবস্থায় থেকে যায়।

প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাবদ্ধ ভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি (Back Swamp) বলা হয় (চিত্র-৫.৯.৩)। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে জলাভূমিও রয়েছে। অনেক সময় এগুলি বিল হিসেবে অবস্থান করে।

পশ্চাৎ ঢাল (Back Slope) : স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত নিচু ঢালু ভূমিকে পশ্চাৎ ঢাল বলা হয়। এ পশ্চাৎ ঢাল জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর পশ্চাতে এরূপ পশ্চাৎ ঢাল রয়েছে।

জলাভূমি (Marshes or Beel) :

নদী গতি পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে উঠে। কিন্তু যে সব স্থান ভরাট হয় না সেখানে পানি জমে জলাভূমির সৃষ্টি করে। আবার প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরের নিচু অঞ্চলে পানি জমেও জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এরূপ জলাভূমিকে বিল (Beel) বলা হয়। রাজশাহীর চলন বিল, গোপালগঞ্জ জেলার বিল ও সিলেটের বিল এ জাতীয় জলাভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নদী বাঁক (Meander) : নদী বাঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীজ বৈশিষ্ট্য যা প্রায়ই চোখে পড়ে। নদী বাঁকের ক্ষয় ক্রিয়ার কারণে নদী খাতের অবস্থানে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, কিন্তু খাতের আয়তন অপরিবর্তনীয় থাকে। নদীর গতিপথে উঁচু-নিচু স্থান বা কঠিন শিলা থাকলে নদীর গতি বেঁকে যায়। একে সর্পিল নদী (Meandering River) বলে। যদিও নদী আঁকাবাঁকা হওয়ার বহুবিধ কারণ আছে। বাঁকের মুখে নদীর তীরের যে স্থানটি স্রোতের ঠিক সম্মুখে থাকে, স্রোতের আঘাত সেখানে খুব বেশী ক্ষয় হয়। ফলে ঐ স্থানে নদী প্রতি বছর ভাঙ্গতে থাকে এবং তার বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় সেখানে পলি মাটি ও বালুকা সঞ্চিত হয়ে চর পড়তে থাকে। বাঁক পার হয়ে পানি স্রোতের গতি আড়াআড়িভাবে নদীপথ অতিক্রম করে। ফলে অপর তীরেও বাঁক সৃষ্টি হয়। এরূপ বাঁক সৃষ্টি করতে করতে নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। বাঁক সৃষ্টির ফলে নদীর দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিতে এরূপ ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। নদী আঁকাবাঁকা হয়ে উত্তল ও অবতল পাড়ের সৃষ্টি করে। উত্তল পাড়ে সঞ্চয় এবং অবতল পাড়ে ক্ষয়সাধন করে। উত্তল পাড়ের পলি সঞ্চয় করে যে সংলগ্ন চরের সৃষ্টি করে তাকে সুঁচালু চর বা বালুচরা প্রান্তর (Point Bar) বলে (চিত্র-৫.৯.৪)।

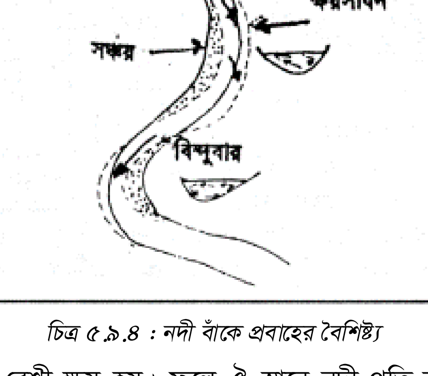

চিত্র ৫.৯.৪ : নদী বাঁকে প্রবাহের বৈশিষ্ট্য

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox Bow Lake) : সমভূমিতে প্রবাহিত কোনো কোনো নদীতে অসংখ্য বাঁক দেখা যায়। কোনো কোনো সময় এ বাঁক এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, দুটি বাঁক নিজেদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এক পর্যায়ে উভয়

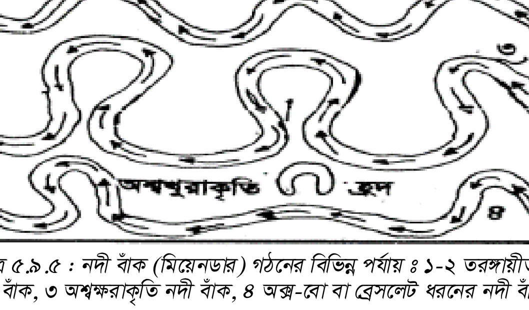

চিত্র ৫.৯.৫ : নদী বাঁক (মিয়েনডার) গঠনের বিভিন্ন পর্যায় ঃ ১-২ তরঙ্গায়ীত নদী বাঁক, ৩ অশ্বক্ষরাকৃতি নদী বাঁক, ৪ অক্স-বো বা ব্রেসলেট ধরনের নদী বাঁক

অংশ মিলে যায় এবং নদী সোজা ভাবে বইতে থাকে। আর ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁকা অংশটি নদীখাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। এরূপ হ্রদগুলো দেখতে অনেকটা অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় বলে এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলা হয় (চিত্র-৫.৯.৫)। বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর শাখাসমূহ বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। সব হ্রদে পলি মাটি সঞ্চিত হলে সেগুলো ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে কর্দম ছিপি (Clay Plug) বলে। এরূপ ভূমিরূপ বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

বালুচর ও বিনুনী নদী (Sand Bar and Barided River) : কোনো নদীর পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত পলি উৎস অঞ্চল থেকে নদীতে সরবরাহ হলে তা নদী খাতেই জমা হয়। নদীর ভেতর বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে বালু চর বলে। এই বালুচর প্রধানত দুটি কারণে সৃষ্টি হয়। প্রথমত, নদীর পানিতে যখন অতিরিক্ত বালু, কর্দম, নুড়ি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে তখন স্রোতের বেগ কমে যায় এবং বাহিত পদার্থসমূহ দ্রুত সঞ্চিত হয়ে বালু চরের (Sand Bar) সৃষ্টি হয়। নদীখাতে অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়নের কারণ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ বহু শাখা বিশিষ্ট পানির ধারা অনেকটা চুলের বিনুনীর মতো দেখতে। একে বিনুনী নদী বা চর উৎপাদী নদীও বলা হয়। যে সকল নদীতে প্রবাহ মাত্রা ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ব্যাপক হয় সেখানে এ ধরনের নদী বিন্যাস দেখা যায়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে এ ধরনের বিনুনী বিন্যাস দেখা যায়। এজন্য যমুনা নদীকে চর উৎপাদী বলা হয়।

ব-দ্বীপ (Delta) : নদীর নিম্ন গতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায় এবং নদীর পানির সঙ্গে মিশ্রিত শিলাচূর্ণ, বালি, কাদা প্রভৃতি তলানিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। নদীর মোহনায় সমুদ্রের লবন মিশ্রিত পানি এ তলানি পড়তে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। নদী যদি কোনো কম স্রোত বিশিষ্ট বা স্রোতহীন সমুদ্রে পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত তলানি নদীর মুখে জমতে জমতে নদী মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে এবং কালক্রমে ঐ চরাভূমি সমূদ্র পানির ওপর উঁচু হয়ে ওঠে। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় ঐ চরাভূমিকে বেষ্টন করে সমুদ্রে পতিত হয়। নদী মোহনাস্থিত ত্রিকোনাকার এ নতুন ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে।

যখন নদী কোনো সাগরে হ্রদে বা অন্য কোনো জলাশয়ে শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয়, তখন নদী পরিবাহিত পলি ঐ অংশে মাত্রাহীন '............-এর (ল্যাটিন .... ডেল্টা) আকারে সঞ্চিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এর আকার আকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে নদীবাহিত পললের পরিমাণ, গঠন ও যেখানে পলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

মিহি পলি ও কর্দম মোহনা থেকে কিছুটা দূরে অনুভূমিক ভাবে সঞ্চিত হয়ে নিম্নতল (Bottom-Set Beds) সৃষ্টি করে। নিম্নতল সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই অগ্রবর্তী তল (Fore-Set Beds) গঠিত হয়। অগ্রবর্তী তল মোটা পলি দ্বারা গঠিত। এ সমস্ত পলি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় নদী সমুদ্র বা হ্রদে প্রবেশ করার পরপরই জমা হয়ে ঢালু স্তর তৈরী করে। এ অগ্রবর্তী তল সাধারণত বন্যাকালীন পলি আস্তরণে ঢেকে যায়। একে উর্ধ্বতল (Top-Set Beds) বলে। ব-দ্বীপ যতোই সমুদ্রের দিকে বাড়তে থাকে নদীর ঢালও ক্রমাগত হ্রাস পায়। এ অবস্থায় নদী দ্রুত গতি ধারা বদল করে এর ভিত্তি তলের সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেয়।

নদীর প্রধান ধারা অনেকগুলো শাখায় (Distributaries) বিভক্ত। এ সমস্ত শাখা নদীর মাধ্যমে প্রবাহ সমুদ্রে পৌঁছে। শাখা নদীসমূহ দ্রুত স্থান বদল করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকৃতি ও শক্তি, জোয়ার ভাটার বৈশিষ্ট্য এবং তটরেখার অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে ব-দ্বীপের আকৃতিতেও বেশ বৈচিত্র দেখা যায়।

পাঠসংক্ষেপ :

নদী সমুদ্রের নিকট এসে উপনীত হলে নদীর ঢাল ও গভীরতা একেবারে কমে যায়। নদীর উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয়। নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদী স্রোতের দ্বারা বাহিত হয়ে নদী গর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদী তার বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদী বাঁক, প্রাকৃতিক বাঁধ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী ও ব-দ্বীপ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. নদী বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হলে নদীর ……… খুব কমে যায়।

১.২. বার্ধক্য অবস্থায় নদীর ……….. অপেক্ষা ……. কার্যই অনেক বেশী হয়।

১.৩. আঁকাবাঁকা নদীর ……….পাড়ে সঞ্চয় এবং ………..পাড়ে ক্ষয়সাধন করে থাকে।

১.৪. নদীর বাঁক বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় নদীর বাঁক অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, একে ..হ্রদ বলে।

১.৫. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদে পলি জমা হয়ে ভরাট হয়ে গেলে একে …… বলে।

১.৬. নদী সমুদ্রে এসে পতিত হলে নদীর মোহনায় যে মাত্রাহীন 'ব' এর মত পলি সঞ্চিত স্থানকে ………………. বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের ৫টি উদাহরণ দিন।
২. পলল পাখা কাকে বলে?
৩. প্রাকৃতিক বাঁধ কাকে বলে?
৪. নদী বাঁক বলতে কি বুঝায়?
৫. বিনুনী নদী কি করে সৃষ্টি হয়?
৬. ব-দ্বীপ কাকে বলে?
৭. ব-দ্বীপ কি করে গঠিত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ-৫.১০

হিমবাহ
Glacier

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- হিমবাহ কি এবং কিভাবে গঠিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন; এবং
- হিমবাহের বিশ্ব বন্টন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

হিমবাহ প্রকৃতপক্ষে চলন্ত বরফের স্তুপ, যা সৃষ্টি হয় তুষারের পুনঃকেলাসায়নের মাধ্যমে। এটি মাধ্যাকর্ষণের টানে এগিয়ে চলে। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো অক্ষাংশে বরফ জমতে পারে, কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩০০ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এটি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এর উৎপত্তি সাধারণতঃ তাপের ওপর নির্ভরশীল। গ্রীষ্ম মন্ডলের উচ্চ পর্বতগাত্রে যেখানে তাপমাত্রা খুবই কম সেখানেও বরফ জমতে পারে। সুতরাং উচ্চ পবর্তগাত্রে তাপ কম বলেই সর্বদাই বরফে আবৃত থাকে। বরফ যখন একটি প্রকান্ড স্তুপ পরিণত হয় তখন আপন ভারে এবং ওপরের চাপে স্থানচ্যুত হয়ে ধীর গতিতে পর্বত গাত্র বেয়ে নিচে নেমে আসে। পার্বত্য এলাকার বরফাচ্ছাদিত উঁচু ঢাল থেকে বিচ্ছিন্ন বরফ/তুষার স্তুপ অকস্মাৎ নিম্নঢালে বা পাদদেশে পতিত হলে তাকে হিমানী সম্প্রপাত বলে। উচ্চ অক্ষাংশের বরফচ্ছাদিত পর্বত গাত্রে প্রায়ংশই হিমানী সম্প্রপাত সংঘটিত হয়। হিমালয় পর্বত গাত্রে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া স্থায়ী বরফক্ষেত্র সব মহাদেশেই পাওয়া যায়। পর্বত গাত্রে যে সীমারেখার উর্ধ্বে বরফ গলে না এবং যার নিচে আসলেই গলে যায় তাকে হিমরেখা (Snowline) বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাপের তারতম্য অনুসারে হিমরেখার উচ্চতার তারতম্য হয়। নিরক্ষরেখা হতে উত্তর ও দক্ষিণে তাপ ক্রমশ কম। সুতরাং হিমরেখার উচ্চতা ক্রমেই কমে আসে। নিরক্ষ প্রদেশে সমুদ্র পৃষ্ট হতে হিমরেখার উচ্চতা প্রায় ৪, ৮৭৫ মি. আল্পস পর্বতের নিকটে প্রায় ২,৭৪৩ মি. রাশিয়ার উত্তরে ল্যাপল্যান্ডের নিকট মাত্র ৯১৫ মি.। মেরু প্রদেশে হিমরেখা প্রায় সমুদ্র পৃষ্ঠে এসে মিশেছে। সেজন্য সারা বছরই মেরু প্রদেশে ঘন বরফ জমে থাকে এবং অনেক স্থানে বৃহৎ বরফের পাহাড় দেখা যায়। এ সব পাহাড় থেকে যে সব বৃহৎ বরফের স্তুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে ভাসতে থাকে সেগুলোকে হিমশৈল (Iceberg) বলে। হিমশৈলগুলো সমুদ্র স্রোতে ভাসতে ভাসতে বহুদূরে চলে যায়। কোনো কোনো হিমশৈল প্রায় ১০৫ কি.মি. লম্বা এবং ১০০-১২১ মি. উঁচু থাকে, কিন্তু সকল হিমশৈলেরই ১/৯ অংশ পানির ওপরে ভাসে। হিমশৈলের আঘাতে অনেক বড় বড় জাহাজ ভেঙ্গে জলমগ্ন হয়। হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে কিংবা ভাসতে ভাসতে নিম্ন অক্ষাংশে পৌঁছলে তা গলতে আরম্ভ করে। তখন হিমশেলের মধ্যে আবদ্ধ শিলাচূর্ণ, কর্দম ইত্যাদি মুক্তি পেয়ে সাগর তলে সঞ্চিত হয়ে বৃহৎ মগ্ন চড়া (Sand Banks) গঠন করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট সমুদ্রবক্ষে গ্রান্ড ব্যাংক (Grand Bank) নামক বিখ্যাত চড়া এরূপে গঠিত।

ভূ-তত্ত্বীয় যুগের অধিকাংশ সময়ে পৃথিবী হিমবাহমুক্ত ছিল। কিন্তু প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর অন্তর ভূ-পৃষ্ঠের হিমযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। প্রত্যেক হিমযুগ কয়েক মিলিয়ন বছর স্থায়ী পর্যন্ত হয়েছিল। এরূপ এক হিমযুগে আন্টার্কটিকা ও গ্রীনল্যান্ডের মতো মহাদেশের ওপর হিমাস্তরনের (Ice Sheet) সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর স্থল পৃষ্ঠের প্রায় ১০ শতাংশ হিমবাহ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। প্রায় ১৮,০০০ বছর আগেও হিমবাহ ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সে সময় পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ হিমবাহ বরফে ঢাকা ছিল। বিগত ২ মিলিয়ন বছর বিশেষ করে শেষ ১ মিলিয়ন বছর কালে হিমবাহ পর্যায়ক্রমে প্রসারিত

ও সংকুচিত হয়েছে। যে সময়ে হিমবাহের সর্বোচ্চ প্রসার হয় তাকে হিমযুগ (Glacial Age) ও যে সময়ে হিমবাহ সবচেয়ে বেশী সংকুচিত হয় তাকে আন্তঃহিমযুগ (Inter-Glacial Age) বা হিমবিরতি যুগ বলে। বর্তমানে পৃথিবী হলোসিন (Holocene) নামে অভিহিত এক আন্তঃহিমযুগে রয়েছে এবং সম্ভবত কয়েক হাজার বছর পরে আর এক হিমযুগের সূচনা হবে। হলোসিন যুগের আগে অর্থাৎ ১০,০০০ থেকে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন (১৮,০০,০০০) বছর আগে পর্যন্ত সময়কে প্লায়োস্টোসিন বা কোয়ার্টানারী যুগ বলে। এটাই সর্বশেষ হিমযুগ যার সমাপ্তি সম্ভবত এখনও হয়নি।

হিমবাহের বন্টন :

বর্তমানে হিমবাহ পৃথিবীর প্রায় ১০ শতাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এটি দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আন্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড, অনেক উত্তর মেরুদ্বীপ সমূহে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে যেমন নিউগিনি এবং নিউজল্যান্ডে দেখা যায়। পূর্ব আফ্রিকার মাউন্ট কেনিয়াতে অল্প পরিমাণ বরফ দেখা যায়।

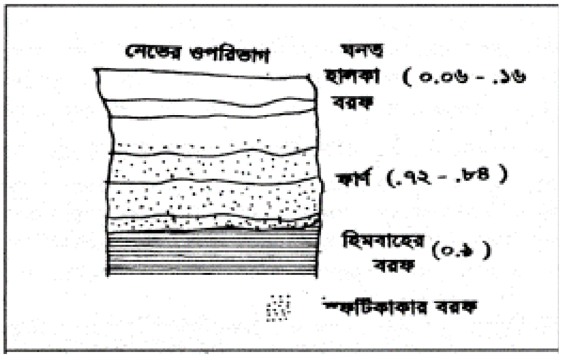

চিত্র ৫.১০.১ : তুষারপাতের উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ। বিভিন্ন অংশ ও তাদের ঘনত্ব দেখান হয়েছে।

হিমবাহ বর্তমানে ৫৮,৮০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা দখল করে আছে। এর মধ্যে ৯৫% হল গ্রীণল্যান্ড ও আন্টার্কটিকার বরফ। আন্টার্কটিকা বরফের আয়তন প্রায় ৪৮,৫০,০০০ বর্গ মাইল এবং গ্রীনল্যান্ডের বরফের আয়তন ৫,৭০,০০ বর্গমাইল। বাকী ৪% বরফ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আন্টার্কটিকা গভীর হিমবাহে আচ্ছন্ন। আসলে এটি এক বিশাল হিমবাহ। সাধারণভাবে এই বরফের গভীরতা ৩,০০০ মি. (৩ কি.মি.)। কোথাও এর গভীরতা ৪,৩০০ মি. পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এসব হিমবাহ লবনহীন পানির বিশাল আধার। অনুমান করা হয়, পৃথিবীর সমস্ত নদনদী সাত শতাব্দী ধরে যে পানি সমুদ্রে বয়ে আনে সেই পরিমাণ পানি হিমবাহের বরফে আটকা পড়ে আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর লবণহীন পানির ৭৫ শতাংশই আন্টার্কটিকায় হিমবাহে আটকা পড়ে আছে।

হিমবাহের উৎপত্তি :

তুষার ক্ষেত্রে উপর্যুপরি তুষার পাতের চাপে বরফে রূপান্তরিত হয়ে হিমবাহের সৃষ্টি করে। এই রূপান্তর বহু দিক দিয়ে পাললিক শিলার সাদৃশ্য, যেখানে তলানিগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পাললিক শিলায় রূপ নেয়। একটি তুষার ক্ষেত্রের দানাকৃতির তুষার খন্ড ও কঠিন হিমবাহের বরফের মাঝামাঝি পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এই মাঝামাঝি পর্যায়কে ফার্ণ (Firn) বলে। ফার্ণ অর্থ গত বছরের। তুষারের স্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে চাপ বেড়ে যায়। ফলে ভেতরের বায়ু বেরিয়ে যেতে থাকে এবং সেই সাথে তুষারের ঘনত্ব বেড়ে যায়। ফলে ভেতরের বায়ু কণাগুলো একটি অপরটির সাথে আলগা ভাবে লেগে থাকে এবং এদের ফাঁকের মধ্যে বাতাসে পূর্ণ থাকে। এরূপ আলগা তুষার কণাগুলোকে নেভে (Neve) বলে। এর ঘনত্ব মাত্র ০.০৫ থেকে ০.১৫ এর মধ্যে থাকে। কয়েক বছরের তুষার পাতের ফলে ওপরের তুষারের চাপে নিম্নস্থ কণা হতে বাতাস বের হয়ে তুষার কণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে বরফে পরিণত হয়। নতুন তুষারের ঘনত্ব যেখানে ০.০৫-০.১৫ সেখানে ফার্ণের ঘনত্ব ০.৭২-০.৮৪ ও বরফের ঘনত্ব ০.৯ পর্যন্ত হয়। নেভে বা তুষারের ফার্ণ এবং

বরফে রূপান্তরিত হওয়া কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে ঊর্ধ্বপাতন, পুনঃকেলাসায়নের মাধ্যমে ছোট ছোট তুষার টুকরাগুলো পরস্পর মিলে বড় বড় তুষার খন্ডে পরিণত হওয়া, গলন, চাপের ফলে পুনঃ জমাট হওয়া এবং ওপরের ওজনের জন্য কাঠিন্য লাভ করে। এসকল পদ্ধতির জন্য তিনটি আদর্শ অবস্থার প্রয়োজন হয়। প্রথমত: একটি কাম্য পরিবেশ দ্বিতীয়ত: আদর্শ উষ্ণতা, ওতৃতীয়ত: নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন তুষারের ঘনত্ব। একথা উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে তুষারের গলনের হার জমার হারের চেয়ে কম সেখানেই বরফ সৃষ্টি হতে পারে। এদের আপেক্ষিক মানের ওপর নির্ভর করে কত বড় ও দ্রুত বরফ সৃষ্টি হবে। আদর্শ উষ্ণতার প্রয়োজন এ থাকে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই এর ঘনত্ব বেড়ে যেতে থাকে। ওপরের ক্রমবর্ধমান ওজনের জন্য তুষারের নিচে কাঠিন্যতা লাভ করতে থাকে। একই সময়ে তুষারের কণাগুলো জমে ফার্ণে রূপ নেয়। যখন এর গভীরতা ১০০-২০০ ফুট হয় তখন প্রায় সব বায়ুই বেরিয়ে যায় এবং এর পর সর্বনিম্ন স্তরে বরফে পরিণত হয়। এভাবে নিম্নতম পর্যায় থেকে ওপর পৃষ্ঠে পর্যন্ত যথাক্রমে বরফ, ফার্ণ ও তুষার অবস্থান করে (চিত্র-৫.১০.১)।

হিমবাহের গতি (Motion of Glacier) :

সাধারণত কয়েকটি কারণে পর্বত গাত্র বা মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ প্রবাহিত হতে থাকে। যেমন, ওপরের তুষারের চাপে নিম্ন স্থানের কিছু পরিমাণ বরফ গলে থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির প্রভাবেও তুষার স্তুপের নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলে কঠিন বরফ স্তুপ আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। এর গতিবেগ বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে হিমবাহের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।

হিমবাহকে বরফের নদী বলা হলেও নদীর ন্যায় হিমবাহের গতি অতো দ্রুত নয়। আল্পসের হিমবাহ প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৫৫ সেন্টিমিটার বা ২২ ইঞ্চি অগ্রসর হয়। হিমবাহের হিমবাহ গড়ে ২.৫ হতে ৭.৫ সেন্টিমিটার বা ১ থেকে ৩ ইঞ্চির মতো নামে। হিমবাহের নিচের দিক অপেক্ষা ওপরের দিকের গতিবেগ অধিক। আবার এর পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মধ্য ভাগের গতিবেগ বেশী। কারণ মধ্যভাগ কেবল হিমবাহের তলদেশ হতে ঘর্ষণের (Friction) ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয় পার্শ্ব হিমবাহের তলদেশ ও পার্শ্ব উভয় দিক হতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এরূপ প্রবাহমান হিমবাহের মধ্যপ্রান্ত অধিক দ্রুত হওয়ায় এর সম্মুখ ভাগ অনেকটা জিহ্বার (Tongue) ন্যায় দেখায়। একে স্নাউট (Snout) বলে।

পাঠসংক্ষেপ :

হিমবাহ প্রকৃতপক্ষে চলন্ত বরফের স্তুপ। পৃথিবীর মোট হিমবাহের শতকরা ৯৫ ভাগই আন্টার্কটিকা ও গ্রীনল্যান্ড বিস্তৃত। বাকী ৪% বরফ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর লবনহীন পানির শতকরা ৭৫ ভাগই আন্টার্কটিকায় হিমবাহে আটকা পড়ে আছে। হিমবাহ প্রকৃতপক্ষে চলন্ত বরফের স্তুপ। সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩০০ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এটি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। পর্বত গাত্রে যে সমীরেখার উর্ধ্বে বরফ গলে না এবং যার নিচে আসলেই গলে যায় তাকে হিমরেখা বলে। মেরু অঞ্চলের হিমবাহ থেকে বিরাট রূপান্তরিত হয়ে হিমবাহের সৃষ্টি করে। এ রূপান্তর পাললিক শিলার অনুরূপ। কয়েক বছর ধরে তুষারপাত হলে তুষার কণা হতে বাতাস বের হয়ে দৃঢ়ভাবে আটকে বরফে পরিণত হয়।

তুষারের চাপে ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তুষার স্তুপের নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বরফ স্তুপ আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। এর গতিবেগ বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে হিমবাহের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। হিমবাহকে বরফের নদী বলা হলেও নদীর ন্যায় হিমবাহের গতি দ্রুত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১০

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. চলমান .... স্তুপকে হিমবাহ (Glacier) বলে।
১.২. .... ছাড়া স্থায়ী বরফক্ষেত্র সব মহাদেশেই পাওয়া যায়।
১.৩ সকল হিমশৈলেরই ....অংশ পানির ওপরে ভাসে।
১.৪. প্রায় ....মিলিয়ন বছর অন্তর ভূ-পৃষ্ঠে হিমযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল।
১.৫. বর্তমানে হিমবাহ পৃথিবীর প্রায় .... শতাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত।
১.৬. আল্পসের হিমবাহ প্রতিদিন গড়ে মাত্র ...... সেন্টিমিটার বা ......ইঞ্চি অগ্রসর হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

১. হিমবাহ কাকে বলে?
২. হিমানি সম্প্রপাত কি?
৩. হিমরেখা বলতে কি বোঝায়?
৪. হিমশৈল কি?
৫. মগ্নচড়া কিভাবে গঠিত হয়?
৬. বর্তমানে পৃথিবীর কত অংশ হিমবাহে আবৃত?
৭. হিমযুগ ও আন্তঃহিমযুগ কাকে বলে?
৮. সমুদ্র সমতলে কোন ভৌগলিক অঞ্চলে হিমবাহ গঠিত হয় না?
৯. আন্টার্কটিকা হিমবাহের গভীরতা কত?
১০. ফার্ণ কি?
১১. তুষার, ফার্ণ ও বরফের ঘনত্ব কত?
১২. বরফের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?
১৩. বরফ তৈরী হওয়ার জন্য যে তিনটি আদর্শ অবস্থার প্রয়োজন সেগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. হিমবাহ কি এবং কিভাবে গঠিত হয়? হিমবাহের বিশ্ব বন্টন বর্ণনা করুন।
২. হিমবাহ কি? হিমবাহের উৎপত্তি এবং গতি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫.১১

হিমবাহের প্রকারভেদ
Type of Glacier

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- হিমবাহের প্রকারভেদ সম্পর্কে জনাতে পারবেন; এবং
- হিমবাহ কি কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে এবং হিমবাহের ক্ষয়সাধন কি কি নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে বিষয়ে বলতে পারবেন।

উৎস ও অবস্থান অনুসারে হিমবাহকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১। মহাদেশীয় হিমবাহ (Continenatal Glacier বা Ice Sheet)
২। উপত্যকা হিমবাহ (Valley Glacier)।
৩। তুষার মুকুট (Ice Cap)।
৪। পাদদেশীয় হিমবাহ (Pidmont Glacier)।

১. মহাদেশীয় হিমবাহ : সুমেরু-সন্নিহিত গ্রীনল্যান্ড ও কুমেরু-সন্নিহিত এন্টার্কটিকা মহাদেশের চারি পার্শ্বে পর্বত বেষ্টিত বিশাল অঞ্চল ব্যাপী যে বরফস্তুপ দেখা যায়, তাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে। এ মহাদেশীয় হিমবাহ পৃথিবীর স্থল ভাগের প্রায় ১/১০ ভাগ অঞ্চল অধিকার করে আছে এবং সমুদ্রের এক বিশাল জলরাশিকে ভূ-ভাগে আটকে রেখেছে। তা না হলে এ বিশাল পরিমাণ জলরাশি সমুদ্রে অবস্থান করে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা আরও ৫৫ মিটার বেড়ে যেত। এ মহাদেশীয় বরফ স্তুপ পূর্বে কোয়ার্টারনারী বরফ যুগে (Quaternary Ice Age) আরও অধিক বিস্তৃত হয়ে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের উত্তর দিকের এক বিশাল অংশকে আবৃত করেছিল। বর্তমানে গ্রীণল্যান্ড ও আন্টার্কটিকা মহাদেশের বরফ স্তুপ কোয়ার্টারনারী বরফ-যুগের অবশিষ্টাংশ রূপে অবস্থান করছে।

আন্টর্কটিকা (Antarctica) : মহাদেশীয় হিমবাহ গ্রীনল্যান্ডের মহাদেশীয় হিমবাহ অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণের অধিক এলাকায় বিস্তৃত। এটি বরফের একটি সুউচ্চ মালভূমিরূপে ৪,২৫৪ মি. অধিক উঁচু হয়ে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গ কি.মি. স্থান ব্যাপী অবস্থান করছে। প্রান্তদেশে কোনো কোনো স্থানে পাহাড় বা উপকূল ভূমি ভিন্ন এ বরফ স্তুপ উপকূল ভাগ অতিক্রম করে সমূদ্রের জলরাশির মধ্যে ভাসমান বরফের তাক বা শেলফের (Floating Ice Shelf) ১৫০° পূঃ থেকে ১৫০° পঃ দ্রাঘিমার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে।

গ্রীনল্যান্ড (Greenland) : গ্রীনল্যান্ডের প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কি.মি. অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহ পর্বত বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছে। এ হিমবাহের মধ্যভাগে বরফের গভীরতা প্রায় ৩,০৪৮ মিটার। ফলে বরফাবৃত এলাকাটির মধ্যভাগ বরফ রাশির প্রচন্ড চাপের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে নেমে গিয়ে সরার ন্যায় চার পাশ উঁচু এবং মধ্য ভাগ নিচু হয়ে অবস্থান করছে।

২. উপত্যকা হিমবাহ : হিমবাহ যখন উঁচু পর্বত গাত্রে উৎপন্ন হয়ে পাহাড়ের উপত্যকার ভেতর দিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন তাকে উপত্যকা হিমবাহ বলে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এ জাতীয় হিমবাহকে উপত্যকা হিমবাহ বলা হয়। আবার এ প্রকার হিমবাহ সর্ব প্রথম আল্পস পর্বতে দৃষ্ট হয়েছিল বলে একে আলপাইন (Alpine) হিমবাহ বলে। এ হিমবাহ অধিক বড় আকৃতির হয় না। এদের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৪ বা ৫ কি.মি. মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গভীরতা ৩-৫ মি. পর্যন্ত হয়।

৩. তুষারমুকুট : পর্বতের মাথার ওপরে বিভিন্ন চূড়ায় ক্রমাগত তুষারপাতের ফলে বরফে আবৃত থাকে। এগুলো বরফের টুপি পরে আছে বলে মনে হয়। তাই অনেক ভূ-বিজ্ঞানী এ স্বল্প বিস্তৃতি বরফাচ্ছাদিত পর্বত চূড়াকে তুষারমুকুট (Ice Cap) বলে অভিহিত করেছেন।

৪. পাদদেশীয় হিমবাহ : পর্বত্য অঞ্চল হতে হিমবাহ যখন নিম্নদিকে পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলে সঞ্চিত হয়, তখন তাকে পাদদেশীয় হিমবাহ বলে। পাদদেশীয় হিমবাহের অগ্রভাগকে লোব (Lobe) বলা হয়। আলাস্কার সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বৃহৎ আকৃতির লোব রয়েছে। এর উপরিভাগ বেশ সমতল, তবে তুষার রাশি কোনো কোনো স্থানে ৩০০ মি. পর্যন্ত গভীর। আলাস্কার বিখ্যাত মালাসপিনা হিমবাহ (Malaspina Glacier) গ্রীনল্যান্ডের পাদদেশীয় হিমবাহের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি প্রায় ৩,৭৫০ বর্গ কি.মি. স্থান ব্যাপী বিস্তৃত। এছাড়া আইসল্যান্ড, আন্টার্টিকা প্রভৃতি শীতল পার্বত্য অঞ্চলেও এ জাতীয় হিমবাহ দেখতে পাওয়া যায়।

হিমবাহের কার্য (Work of Glaciers) : নদী ও বায়ুর ন্যায় হিমবাহ ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন- এ তিন প্রকার কার্য করে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্য সর্বাপেক্ষা অধিক। বহন ও অবক্ষেপন কার্য এর নিম্নাংশে সাধিত হয়। বিভিন্ন অবস্থায় হিমবাহের সমস্ত কার্যকে গ্লাসিয়েশন (Glaciation) বলে।

ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে (Agents of Erosion) : হিমবাহ সাধারণত কয়েকটি নিয়মে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে। যথা:

১) **ঘর্ষন (Abrasion) :** হিমবাহের ঘর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এ ক্রিয়া হিমবাহের ওজন ও উর্ধ্বস্থ হিমাগারে চাপের দ্বারা সংঘটিত হয়।

২) **আঁচড় কাটা (Scratching) :** চলমান হিমবাহের তলদেশে বরফের সাথে সংযুক্ত যে প্রস্তরখন্ডগুলো থাকে তাদের ঘর্ষণে উপত্যকার শিলারাশির ওপর ক্রমাগত আঁচড় পড়তে থাকে। এরূপ আঁচড় পড়তে পড়তে শিলাসমূহ ক্ষয় হয়। হিমবাহের এ প্রকার ক্ষয় ক্রিয়াকে ঘর্ষণ ক্রিয়া বলে।

৩) **মসৃণ করা (Polishing) :** হিমবাহের তলদেশে সংযুক্ত প্রস্তরখন্ডসমূহ ভূ-ক্ষয় এবং ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় হিমবাহের উপত্যকার শিলা ক্রমান্বয়ে মসৃণতা লাভ করে।

৪) **উৎপাটন (Plucking) :** হিমবাহ বিধৌত অঞ্চলে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দিনের বেলায় বরফ গলে পানি ফাটলে প্রবেশ করে রাতে পানি ফাটলের মধ্যে বরফে পরিণত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে পর্বতের ফাটল বা ছিদ্র হতে পস্তরখন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাহিত হিমবাহের সাথে বহুদূরে নীত হয়, একে উৎপাটন বলে।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে হিমবাহের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় হয়। কিন্তু এ ক্ষয়সাধরন আবার নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের (নিয়ামক) ওপর অনেকাংশ নির্ভরশীল :

ক) **হিমবাহের আকার** : হিমবাহের আকারের ওপর ক্ষয়সাধন ক্রিয়া নির্ভরশীল। হিমবাহের স্তুপ অধিক বড় হলে ক্ষয়সাধনও বেশী হবে। কিন্তু হিমবাহের আকার ছোট হলে ক্ষয়সাধন খুবই কম হয়।

খ) **হিমবাহের বহনকৃত পদার্থের পরিমাণ** : চলমান হিমবাহের তলদেশে বরফের সঙ্গে সংযুক্ত যে প্রস্তর খন্ডসমূহ থাকে তাদের ঘর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয় হয়। এ প্রস্তরখন্ডসমূহের পরিমাণ অধিক হলে এর ক্ষয়সাধন প্রবল হয়।

গ) **হিমবাহের গতি** : হিমবাহের গতি মন্থর হলে ক্ষয় খুবই কম হয়। কিন্তু পর্বত গাত্রে এর গতি একটু বেশী বিধায় ক্ষয়সাধনও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়।

ঘ) হিমবাহের তলদেশের শিলার অবস্থা : হিমবাহ যে ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই ভূমি নরম শিলা দ্বারা গঠিত হলে এর ক্ষয়সাধন খুব বেশী হয়। কিন্তু ঐ শিলা কঠিন হলে হিমবাহের দ্বার ক্ষয়সাধন খুবই কম হয়।

পাঠসংক্ষেপ:

উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী হিমবাহকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। মহাদেশীয় হিমবাহ স্থলভাগের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ অঞ্চল অধিকার করে আছে। বর্তমানে আন্টার্কটিকা ও গ্রীনল্যান্ড কোয়ার্টারনারী বরফ যুগের অবশিষ্টাংশরূপে অবস্থান করছে। পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্য সর্বাপেক্ষা অধিক। হিমবাহ ঘর্ষণ, আঁচড়ান, মসৃন করা ও উৎপাটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে থাকে। হিমবাহের ক্ষয়সাধন নিম্নোক্ত উপাদান সমূহের ওপর নির্ভর করে। যথা-(১) হিমবাহের আকার, (২) বহনকৃত পদার্থের পরিমাণ। (৩) হিমবাহের গতি ও (৪) হিমবাহের তলদেশে শিলার অবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৫.১১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. **শূণ্যস্থানপূরণ করুন :**

১.১. উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী হিমবাহকে ....শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

১.২. আন্টার্কটিকা মহাদেশীয় হিমবাহ গ্রীনল্যান্ডের মহাদেশীয় হিমবাহ অপেক্ষা প্রায় .... গুণের অধিক এলাকায় বিস্তৃত।

১.৩. পার্বত্য অঞ্চল হতে হিমবাহ যখন নিম্নদিকে পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলে সঞ্চিত হয়, তখন তাকে .... হিমবাহ বলে।

১.৪. হিমবাহ বিধৌত অঞ্চলে দিন ও রাত্রির .... বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১.৫. হিমবাহের গতি মন্থর হলে .... খুবই কম হয়।

১.৬. পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্য সর্বাপেক্ষা................।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. হিমবাহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

২. মহাদেশীয় হিমবাহ কাকে বলে?

৩. উপত্যকা হিমবাহ কাকে বলে?

৪. হিমবাহের কার্য কি কি?

৫. হিমবাহর দ্বারা ক্ষয়সাধন যে সমস্ত নিয়ামকের উপর নির্ভর করে সেগুলো কি কি?

৬. হিমবাহ কি কি কাজ করে থাকে?

৭. পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ কোন কাজটি সর্বাধিক করে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বিভিন্ন প্রকার হিমবাহের এবং হিমবাহের কাজের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.১২

হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
Erosional Features of Glacier

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

হিমবাহের ক্ষয় সাধনের ফলে অনেক নতুন নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকার হিমবাহের বিভিন্ন ধরনের ক্ষয় সাধনের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষয়জাত ভূমিরূপের সৃস্টি করে :

১) হৈমবাহিক উপত্যকা (Glaciated Valley),
২) ঝুলন্ত উপত্যকা (Hanging Valley),
৩) সার্ক বা কোরি (Cirque or Corrie),
৪) এরিটি ও পিরামিডীয় শৃঙ্গ (Cirque or Corrie),
৫) নুনাট্যাক (Nunatak),
৬) রসে মতানো (Roche Moutonnee),
৭) হিমসিড়ি ও প্যাটার্নস্টারহ্রদ (Glacial Stairway and Paternoster Lake),
৮) শৈলময় পর্বত ও অনিয়মিত প্রস্তরখন্ড (Rocky Mountains and Erratic Gravel),
৯) ক্রিভাসেস (Crevasses),
১০) ঢিবি ও পুচ্ছ (Crag and Tail),
১১) দানবীর সিঁড়ি (Cyclopean Stairs),
১২) ফিয়র্ড (Fiord) এবং
১৩) কর্তিত স্পার (Truncated Spur)।

১) **হৈমবাহিক উপত্যকা :** উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ পর্বতের হিমবাহিক উপত্যকা বলে। এ উপত্যকা হিমবাহগুলো উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলসমূহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এগুলো পূর্বেকার কোনো উপত্যকার (Pre-existing Valley) মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে নিম্ন দিকে নেমে থাকে। এদের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য নির্ভর করে তুষার ক্ষেত্রের বিস্তার, তুষার পাতের পরিমাণ এবং উপত্যকা অঞ্চলের উত্তাপের পরিমাণের ওপর। হিমালয়ের অধিকাংশ হিমবাহ এ শ্রেণীর (উপত্যকা হিমবাহ) অন্তর্গত এবং আয়তনে ক্ষুদ্র।

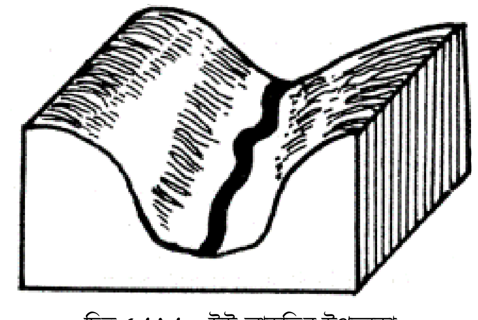

চিত্র ৫.১২.১ : ইউ আকৃতির উপত্যকা

হিমবাহ উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপত্যকাকে ক্ষয় ও মসৃন করে ইংরেজী ইউ (U) অক্ষরের মত করে। এরূপ উপত্যকাকে ‘ইউ-আকৃতি’ (U-shaped) উপত্যকা বলে (চিত্র: ৫.১২.১)। এর মধ্যভাগ প্রশস্ত ও গভীর এবং পার্শ্বদেশ অত্যন্ত খাড়া থাকে। রকি, আলাস্কা প্রভৃতি পর্বতে (U) -আকৃতির বহু হৈমবাহিক উপত্যকা দেখা যায়।

২) **ঝুলন্ত উপত্যকা** : প্রধান নদীর সঙ্গে ছোট ছোট উপনদী যেমন এসে মিলিত হয়, সেইরূপ প্রধান হিমবাহের সাথে ছোট ছোট হিমবাহ বা উপ-হিমবাহ (Tributary Glacier) এসে

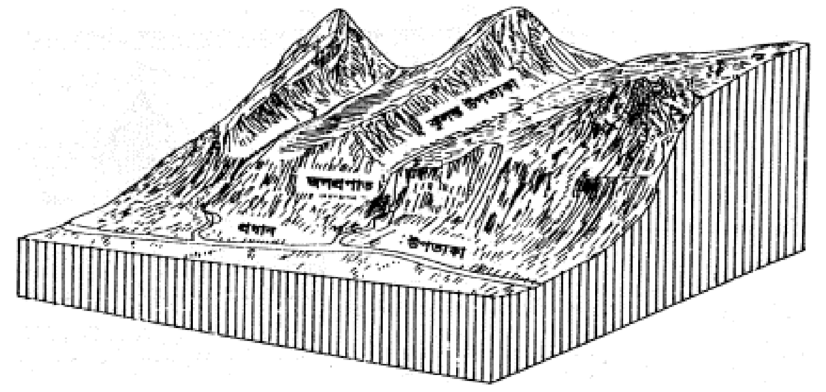

চিত্র ৫.১২.২ : ঝুলন্ত উপত্যকা

মিলিত হয়ে থাকে। প্রধান হিমবাহ আকারে বৃহৎ হওয়ায় এদের উপত্যকা ক্ষুদ্রকার হিমবাহের উপত্যকা অপেক্ষা অধিক গভীর হয়। পরে এই উপত্যকা থেকে হিমবাহ সরে গেলে ক্ষুদ্রকার হিমবাহের উপত্যকা মনে হয় যেন প্রধান হিমবাহের উপত্যকার ওপর ঝুলছে। এরূপ উপত্যকাকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে (চিত্র-৫.১২.২)।

৩) **সার্ক বা কোরি** : হিমবাহ উপত্যকার ওপরের অংশে সাধরণতঃ শিলা গঠিত গর্তের সৃষ্টি হয় যার একদিকে খুব খাড়া ঢাল যুক্ত প্রস্তর প্রাচীর এবং অপরদিকে উন্মুক্ত থাকে (Steep-sided Rock Basin)। এটি দেখতে অনেকটা বড় হাতলওয়ালা ডেক চেয়ারের মত হয়। এ প্রকার ভূমিরূপকে ফরাসী ভাষায় সার্ক (Cirque), ইংরেজী ভাষায় কোরি (Corrie) এবং ওয়েলস ভাষায় কুম (Cum) বলা হয় (চিত্র-৫.১২.৩)। হিমবাহ অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে সম্ভবত: সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হলো এ সার্ক বা কোরি। সার্ক বা কোরির পেছনের অংশ খাড়া, মধ্যভাগ নিচু গর্ত এবং সম্মুখ ভাগ সমান্য ঢালু। সম্মুখ ভাগের প্রান্তে প্রস্তর খন্ড, কাঁকর, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে উঁচু শিলা গঠিত হয়। বর্তমানে বরফহীন বা প্রায় বরফহীন সার্কগুলো সিয়েরানেভাদা, কাসকেড, রকি, পর্বত এবং ইউরোপের উচ্চ পর্বতগুলোতে অধিক দেখতে পাওয়া যায়।

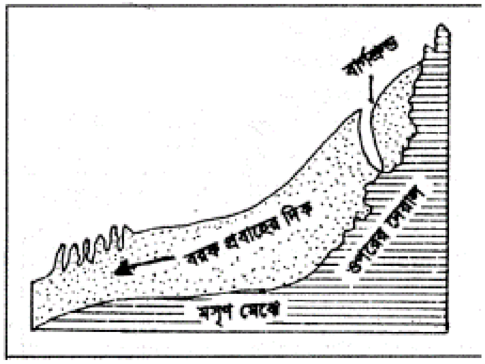

চিত্র ৫.১২.৩ : সার্ক বা কোরি

৪) **এরিটি ও পিরামিডীয় শৃঙ্গ** : পাশাপাশি দুটি সার্ক বা কোরি স্যাপিং (Sapping) প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ বর্ধিত হলে তাদের মধ্যবর্তী উচ্চ খাড়া অংশকে করাতের দাঁতের মতো দেখতে হয়। একে এরিটি (Arete বা Serrated Ridge) বলে (চিত্র-৮.৫)। আবার কোনো গম্বুজ আকারে পাহাড়ের চারদিক চারটি সার্ক পাশাপাশি গঠিত হলে এদের মধ্যভাগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খুবই খাড়া এবং তীক্ষ্ণ ফলার ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একে অনেকটা পিরামিডের

মতো দেখায়। এরূপ পর্বত চূড়াকে পিরামিডীয় শৃঙ্গ (Pyramidal Peak or Horn) বলে (চিত্র-৫.১২.৪।

৫) **নুনাট্যাক** : হিমবাহের ক্ষয় সাধনের ফলে অনেক সময় অধিকাংশ শিলা গলে যায় কিন্তু মাঝে মাঝে কঠিন শিলা না গলে বরফের ভেতর দ্বীপের মতো পাড়ে থাকে। হিমবাহ অঞ্চলে এরূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত দ্বীপকে নুনাট্যাক বলে। অনেক সময় ছোট ছোট পাহাড়ের এরূপ অবেশাষাংশকে ইনসেলবার্গ (Mseberg) বলে।

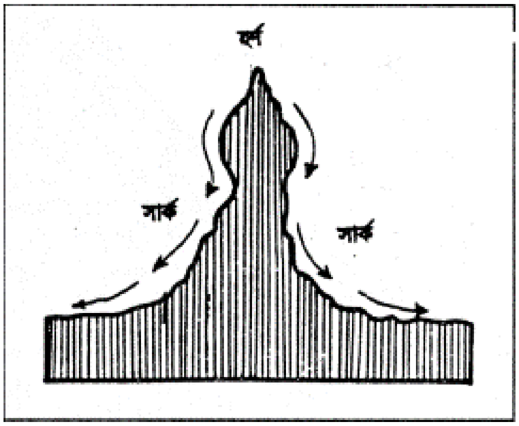

চিত্র ৫.১২.৪ : হর্ণ/এরিট/পিরামিডাল শৃঙ্গ

৬) **রসে মুতানে** : অনেক সময় উপত্যকার মধ্যে উচ্চ ঢিবির আকারে অবস্থিত প্রস্তর খন্ডের ওপর দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হলে হিমবাহের ঘর্ষণে, ঐ প্রস্তর খন্ডে হিমবাহ প্রবাহের বিপরীত দিকের অংশ অসমতল ও ফাটলযুক্ত এবং তার সম্মুখভাগ অর্থাৎ হিমবাহ প্রবাহের দিক মসৃণ হয়ে টিলার আকারে অবস্থান করে। একে রসে মাতানে (চিত্র-৫.১২.৫) বলে। হিমবাহ উপত্যকার খাড়া অংশের নিকট এসে শেষ হয়ে গেলে, তাকে দ্রোণী-প্রান্ত (Trought Ends) বলে।

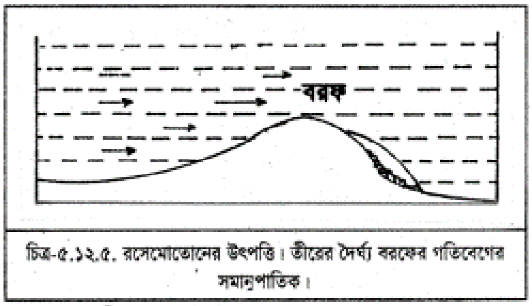

চিত্র ৫.১২.৫ : রসেমোতোনের উৎপত্তি। তীরের দৈর্ঘ্য বরফের গতিবেগের সমানুপাতিক

৭) **হিমসিঁড়ি ও প্যাটার্নস্টার হ্রদ** : পার্বত্য উপত্যকার সমগ্র অংশ ব্যাপী হিমবাহ প্রবাহিত না হলে, উপত্যকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলক ক্ষয়ক্রিয়ার দরুন ঢালের পার্থক্য দেখা যায় এবং শিলা ধাপ (Steps বা Benches) গঠিত হয়। এ ধাপগুলো অনেক সময় ধীরে ধীরে সিঁড়ির ন্যায় নামতে থাকে। একে হিমসিঁড়ি বলা হয়। অনেক সময় একে হিমসিঁড়ি বলা হয়। অনেক সময় এ হিমসিঁড়ি বা ধাপগুলোর ঢাল নিচের দিকে না হয়ে ওপরের দিকে অর্থাৎ উঁচু পর্বত গাত্রের দিকে হয় এবং তাতে পানি আটকিয়ে সারিবদ্ধ হ্রদের সৃষ্টি করে। এরূপ হ্রদকে প্যাটার্নস্টার হ্রদ বলা হয়।

৮) **শৈলময় পর্বত ও অনিয়মিত প্রস্তখন্ড** : হৈমবাহিক অঞ্চলের শিলারাশি একইরূপ উপকরণ দিয়ে গঠিত হয় না। এ শিলাসমূহের কোনো অংশ নরম এবং কোনো অংশ কঠিন থাকতে পারে। নরম শিলা সহজেই হিমবাহের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কঠিন শিলাগুলো অল্প ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট পর্বত আকারে থেকে যায়। হিমবাহের ক্ষয়সাধন দ্বারা এরূপ ভূ-খন্ডের সৃষ্টি হলে তাকে শৈলময় পর্বত বলে। হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে হৈমবাহিক অঞ্চলে যে অসমান প্রস্তখন্ড পড়ে থাকে সেগুলোকে অনিয়মিত প্রস্তরখন্ড বলে।

৯) ক্রিভাসেস বা ফাটল (Crevasses) : ঢালু পর্বতের ওপর থেকে হিমবাহ নেমে যাওয়ার সময় ভূমির ঢাল বৃদ্ধি পেলে হিমবাহের বরফের গায়ে অনেক ফাটল দেখা যায়। এরূপ ফাটল ক্রেভাসেস (Crevasses) বলে। ক্রেভাসেসগুলো আড়াআড়ি (Transverse), প্রান্তীয় (Marginal), বা অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal) ভাবে গঠিত হতে পারে।

১০) টিলা ও পুচ্ছ (Carg and Tail) : হিমবাহের গতিপথে কোনো কঠিন শিলাখন্ডের পশ্চাতে নরম শিলা থাকলে, কঠিন শিলা পশ্চাতের নরম শিলাকেও হিমবাহের ক্ষয়কার্য থেকে রক্ষা করে। এর ফলে কঠিন শিলা উঁচু ঢিবির ন্যায় থাকে। একে ক্রাগ (Carg) বা প্রস্তর চূড়া বলে। পশ্চাতে (Lee) নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে সরু লেজের ন্যায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উঁচু হয়ে অবস্থান করে। একে লেজ বা টেল (Tail) বলে (চিত্র-৫.১২.৬)

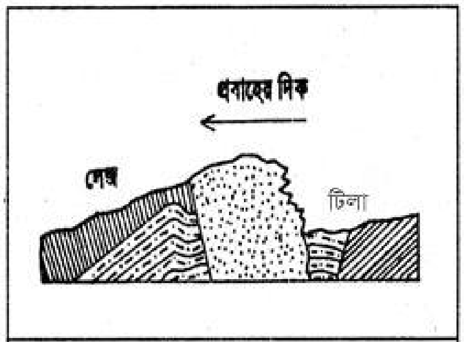

চিত্র-৫.১২.৬. টিলা ও লেজ (Crag and Tail)

১১) দানবীয় সিঁড়ি (Cyclopean Stairs) : উঁচু পর্বত হতে প্রবাহিত উপত্যকার ওপরের অংশ বেশ খাড়া থাকে এবং মধ্য অংশে গর্তের সৃষ্টি হয়। তখন উপত্যকার এ অংশ বড় হাতলওয়ালা ডেক চেয়ারের মতো দেখায়। অনেক সময় হিমবাহের উপত্যকা পর্যায়ক্রমে নরম ও কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত থাকে। হিমবাহের ঘর্ষণে নরম শিলা ক্ষয় হয়ে খাতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্য ভাগের কঠিন শিলা বেঞ্চের (Benches) মতো অবস্থান করে। হিমবাহের উপত্যকায় এরূপ পর পর আগত বেঞ্চগুলোকে দানবীর সিঁড়ি বলে।

১২) ফিয়র্ড (Fiord) : উপকূলবর্তী অঞ্চলে হিমবাহ তার উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা অধিক গভীর পর্যন্ত কেটে থাকে। ফলে এই সকল প্রশস্ত ও গভীর উপত্যকাগুলো জলমগ্ন হয়ে ফিয়র্ডের (Fiord) সৃষ্টি করে। মহাদেশীয় হিমবাহ যখন সমুদ্রে এসে পড়তে থাকে তখন তাদের ঘর্ষণে সমুদ্র উপকূলের শিলা ক্ষয় পায়। এরূপে সমুদ্র উপকূলে হিমবাহের দ্বারা গভীর নিমজ্জিত হৈমবাহিক উপত্যকার সৃষ্টি হলে তাকে ফিয়র্ড বলে। গ্রীনল্যান্ড, নরওয়, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি উচ্চ অক্ষাংশের দেশে এরূপ হৈমবাহিক ফিয়র্ড (Glacial Fiord) দেখতে পাওয়া যায়।

১৩) কর্তিত স্পার (Truncated Spur) : পূর্বেই বলা হয়েছে, উপত্যকা হিমবাহ পূর্বেকার নদী উপত্যাকা অধিকার করে। পার্বত্য অংশে নদী অভিক্ষিপ্তাংশের যোগাযোগের (Interlocking Spur) মধ্য দিয়ে ছোট ছোট বাঁকা নিয়ে প্রবাহিত হয়। যদিও হিমবাহ মোটামুটি নদী উপত্যকাকে অনুসরণ করেই প্রবাহিত হয় তবে হিমবাহ নদীর মতো ততোটা বেশী আঁকাবাঁকা পথে চলতে পারে না এবং কিছুটা সোজা পথ অনুসরণ করে। ফলে প্রবাহকালে হিমবাহ অভিক্ষিপ্তাংশের অগ্রভাগ কেটে কিছুটা সোজা পথে অগ্রসর হয়। এরূপ প্রান্তভাগ কর্তিত অভিক্ষিপ্তাংশকে কর্তিত অভিক্ষিপ্তাংশ বলে ।

পাঠসংক্ষেপ :

হিমবাহের ক্ষয়সাধনের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ : হিমবাহ চলার পথে বিভিন্ন উচ্চতায় ও ঢালে বিভিন্ন পরিমাণ ও ধরণের ক্ষয়কার্য সম্পন্ন করে নানা প্রকার ভূ-প্রাকৃতিক রূপের সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. পাশাপাশি দুটি সার্ক বা কোরি স্যাপিং প্রক্রিয়ায় ক্রমশ: বর্ধিত হলে তাদের মধ্যবর্তী উচ্চ খাড়া অংশকে করাতের দাঁতের মতো দেখতে হয়, একে ......বলে।

১.২. হিমবাহ উপত্যকার খাড়া অংশের নিকট এসে শেষ হয়ে গেলে, তাকে .... বলে।

১.৩. হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে হৈমবাহিক অঞ্চলে যে অসমান প্রস্তরখন্ড পড়ে থাকে সেগুলো .... প্রস্তরখন্ড বলে।

১.৪. হিমবাহের উপত্যকায় পর পর আগত বেঞ্চগুলোকে .... বলে।

১.৫. এরূপে সমুদ্র উপকূলে হিমবাহের দ্বারা নিমজ্জিত হৈমবাহিক উপত্যকার সৃষ্টি হলে তাকে .... বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। হিমবাহের ক্ষয়কার্য কি কি ভাবে হয়ে থাকে?

২। হিমবাহের ক্ষয়সাধন কি কি নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। হিমবাহের ক্ষয়জনিত ভূমিরূপের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.১৩

হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
Depositional Features of Glacier

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- হিমবাহ কি কি উপায়ে সঞ্চয়কার্য করে থাকে তা জানতে পারবেন;
- হিমবহের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয়ে সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ আলোচনা করতে হলে যে প্রশ্নটি আসে তা হলো কেন সঞ্চিত হয়? হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়জাত পদার্থ কোথাও না কোথাও সঞ্চিত হবেই। ক্ষয়জাত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাহিত হয়ে (Transportation) অবশেষে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতির সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।
হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় তার সঙ্গে প্রস্তর খন্ড, বালুকা, কর্দম ইত্যাদি বহুদূরে বাহিত হয়ে থাকে। এছাড়া হিমবাহ গলিত পানির স্রোতের সঙ্গে কর্দম, বালুকা, কাঁকর ইত্যাদিও অনেক দূরে অগ্রসর হয়। অবশেষে এরা পর্বতের নিম্নাংশ ও সমতল ভূমিতে সঞ্চিত হয়।

হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Depositional Features of Glacier) :

হিমবাহের সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বলা হয়। হিমবাহ দু'ভাগে সঞ্চয়কার্য করে থাকে। প্রথমটি হলো হিমবাহ নিজেই কাঁকর, প্রস্তরখন্ড, বালু, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চয় করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিমবাহ গলিত পানি ধারা ঐ সকল পদার্থ সঞ্চিত করে। তাই হিমবাহের সঞ্চয় দু'প্রকার। যেমন (১) হিমবাহের সঞ্চয় (Glacial Deposits), এবং (২) হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় (Fluvio-glacial Deposits বা Glacio-fluvial Deposits)। হিমবাহের সঞ্চয়ের ফলে যে ভূমিরূপের উদ্ভব হয় তাতে কোনো স্তর থাকে না। এ জাতীয় সঞ্চয়কে অস্তরীভূত সঞ্চাত (Unstratified Drift) এবং হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় দ্বারা যে ভূমিরূপের উদ্ভব হয় তাতে স্তর থাকায় ঐ ধরনের সঞ্চয়কে স্তরীভূত সঞ্চাত (Stratified Drift) বলে।

বিভিন্ন পদার্থ হিমবাহ দ্বারা সঞ্চিত হয়ে স্তুপাকারে নানা প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। যেমন,- গ্রাবরেখা, ড্রামলিন, অনিয়মিত শিলাপিন্ড, হিমবাহ সমভূমি ইত্যাদি।

১) **হিমবাহজাত সঞ্চয় (Glacial Deposits)** -: হিমবাহের ঘর্ষণে ও চাপে বড় বড় শিলা খন্ডগুলো ভেঙ্গে চুরে স্থানান্তরিত হয়। এরূপ আনীত ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের প্রস্তরখন্ড, নুড়ি, কাঁকর ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে স্তুপাকারে নানা প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। যেমন, গ্রাব রেখা, ড্রামলিন, অনিয়মিত শিলাপিন্ড (Erratic Block) হিমবাহ সমভূমি ইত্যাদি।

হিমবাহ অধ্যুষিত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের অবক্ষেপ (Deposition in Glaciated Uplands)

১) **গ্রাবরেখা (Moraine)** -: উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের চিহ্নই অধিক দেখতে পাওয়া যায় বটে, তবে এ অংশে কিছু কিছু অবক্ষেপনও হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গ্রাবরেখা স্তরে স্তরে এ অঞ্চলে অবক্ষেপন হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখন্ড হিমবাহের পার্শ্বে ও সম্মুখে স্তুপাকারে সঞ্চিত হয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এ ধরনের শিলাস্তুপকে গ্রাবরেখা বলে (চিত্র-৫.১৩.১)।

হিমবাহ অগ্রসর হবার সময় তার সাথে আনীত প্রস্তরখন্ড, কাঁকর, বালুকা, কর্দম ইত্যাদি তার পথের আশে পাশে, মধ্যভাগে বা শেষ প্রান্তে সঞ্চিত করে বলে তাদের অবক্ষেপনের স্থান অনুসারে তাদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি হল :

হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের শ্রেণীবিভাগ

হিমবাহজাত সঞ্চয় (অন্তরীভূত সঞ্চয়)	হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় (স্তরীভূত সঞ্চয়)
১) গ্রাবরেখা	১) হিমবিধৌত সমভূমি
২) ড্রামলিন	২) এস্কার
৩) অনিয়মিত শিলাপিন্ড	৩) কেম
৪) হিমবাহ সমভূমি	৪) ভ্যালিট্রেন
	৫) ভার্ব

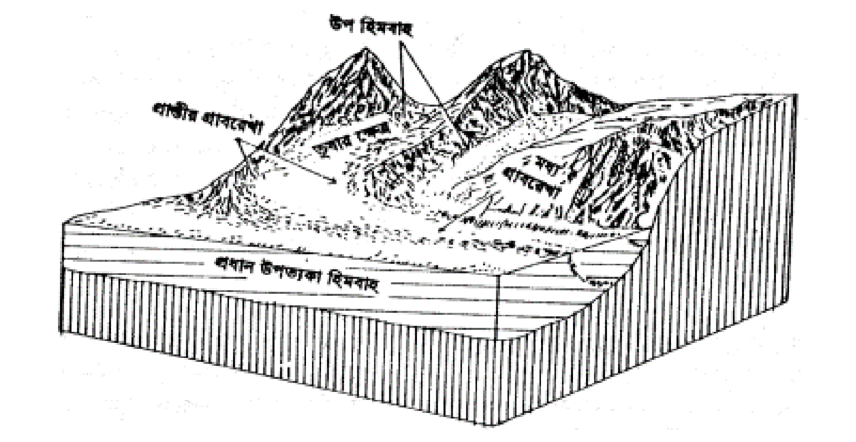

চিত্র ৫.১৩.১ : গ্রাবরেখার শীর্ষের বিভিন্ন আকৃতি

গ্রাবরেখা এখানে ১৫ প্রকারের তালিকাবদ্ধ করলেও এগুলির মধ্যে প্রধান গ্রাবরেখাগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ভূমিগ্রাব রেখা, পার্শ্ব গ্রাবরেখা, মধ্য গ্রাবরেখা, ও প্রান্ত গ্রাবরেখা।

বিভিন্ন প্রকারের গ্রাবরেখা :

i) ভূমি গ্রাবরেখা (Ground Moraine)
ii) বোল্ডার ক্লে বা টিল (Boulder Clay of Till)
iii) পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral Moraine)
iv) মধ্য গ্রাবরেখা (Medical Moraine)
v) প্রান্ত গ্রাবরেখা (Terminal or End Moraine)
vi) আবদ্ধ গ্রাবরেখা (Englacial Moraine)
vii) তলদেশ গ্রাবরেখা (Sub-Glacial Moraine)
viii) পুশ গ্রাবরেখা (Push Moraine)
ix) ডাম্প বা স্তুপ গ্রাবরেখা (Dump Moraine)
x) সম্পৃক্ত গ্রাবরেখা (Lodge Moraine)
xi) আন্তঃলোব গ্রাবরেখা (Interlobate Moraine)
xii) ওয়াশ বোর্ড গ্রাবরেখা (Wash Board Moraine)
xiii) খাত কাটা গ্রাবরেখা (Fluted Moraine)
xiv) রোজেন গ্রাবরেখা (Rogen Moraine)
xv) পশ্চাদগামী গ্রাবরেখা (Recessional Moraine)

i) ভূমি গ্রাবরেখা : যে ভূমির ওপর দিয়ে হিমবাহ চলতে থাকে সে ভূমিতে যে গ্রাবরেখা গঠিত হয় তাদের ভূমি গ্রাবরেখা বলে। ভূমি গ্রাবরেখা বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর খন্ডের সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয়ে থাকে। এদের ওপরিভাগ অসমান হয়।

ii) বোল্ডার ক্লে বা টিল : কোল্ডার ক্লেও ভূমি গ্রাবরেখা রূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে। স্তরবিহীন বালু ও কর্দমের ওপর ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির প্রস্তর খন্ড সঞ্চিত হয়ে বোল্ডার ক্লে গঠিত হয়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বহু স্থানে বোল্ডার ক্লে সঞ্চিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন আকৃতির প্রস্তর খন্ড সঞ্চিত না হয়ে একই ধরনের প্রস্তর খন্ড সঞ্চিত হয়ে ভূমি গ্রাবরেখা রূপে অবস্থান করলে তাকে টিল (Till) বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিম ভাগে প্রায় ২.৫ হাজার বর্গ কি.মি. স্থান ব্যাপী সুবিস্তৃত চাদরের ন্যায় টিল সঞ্চিত আছে।

iii) পার্শ্ব গ্রাবরেখা : হিমবাহের উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত করে পার্শ্ব গ্রাবরেখা গঠন করে। এদের উচ্চতা কয়েকশত মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা অস্থায়ীভাবে গঠিত হয় এবং হিমবাহ গললে অদৃশ্য হয়।

iv) মধ্য গ্রাবরেখা : দুদিক থেকে দুটি হিমবাহ এসে এক স্থানে মিলিত হলে উভয়ের মধ্যস্থানে যে গ্রাবরেখা গঠিত হয় তাকে মধ্য গ্রাবরেখা বলে। এরা দীর্ঘ সরু শৈল শিরার ন্যায় হিমবাহের গতি বরাবর অবস্থান করে। আবার হিমবাহিক উপত্যকার মধ্য ভাগে কর্দম, কাঁকর, প্রস্তরখন্ড ইত্যাদি স্তুপাকারে সঞ্চিত হয়েও এ জাতীয় গ্রাবরেখা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রাবরেখা দুদিক দিয়ে হিমবাহ নিচের দিকে অগ্রসর হয়।

v) প্রান্ত গ্রাবরেখা : হিমবাহের দ্বারা নীত পদার্থ হৈমবাহিক উপত্যকার শেষভাগে স্তুপের মতো সঞ্চিত হলে একে প্রান্ত গ্রাবরেখা বলে। হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরন করলে প্রান্ত গ্রাবরেখা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

vi) আবদ্ধ গ্রাবরেখা : ওপরে বর্ণিত গ্রাবরেখাগুলো ব্যতীত আরও দুই প্রকার গ্রাবরেখা দেখতে পাওয়া যায়। হিমবাহের ফাটলের (Crevasses) মধ্য দিয়ে প্রস্তর খন্ড অনেক সময় হিমবাহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একে আবদ্ধ গ্রাবরেখা বলে।

vii) তলদেশ গ্রাবরেখা : প্রস্তর খন্ড পর্বতগাত্র ও হিমবাহের ফাটলের মধ্য দিয়ে হিমবাহের তলদেশে পৌঁছলে, তাকে তলদেশ গ্রাবরেখা বলা হয়।

অবক্ষেপনের পার্থক্য অনুযায়ী প্রান্ত গ্রাবরেখাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) পুশ গ্রাবরেখা, (খ) ডাম্প বা স্তুপ গ্রাবরেখা ও (গ) অস্থায়ী গ্রাবরেখা

viii) পুশ গ্রাবরেখা : হিমবাহ যদি প্রান্তের অগ্রগমন জনিত ঠেলা বা ধাক্কায় ভূমি গ্রাবরেখা শৈল শিরার আকার ধারণ করে তাহলে তাকে পুশ গ্রাবরেখা বলে।

ix) ডাম্প বা স্তুপ গ্রাবরেখা : এরকম ক্ষেত্রে হিমবাহ শরীরের মধ্যে ও ওপরে যে গ্রাবরেখা অবস্থান করে হিমবাহের গলনের ফলে প্রান্তদেশের পার্শ্বপৃষ্ঠে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে প্রান্তদেশের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসে ও স্তুপীকৃত হয়ে ডাম্প বা স্তুপ গ্রাবরেখার সৃষ্টি করে।

x) সম্পৃক্ত গ্রাবরেখা : হিমবাহের তলদেশের পানি সম্পৃক্ত গ্রাবরেখা বিভেদমূলক চাপের ফলে প্রান্তদেশে পিষ্ট হয়ে অস্থায়ী গ্রাবরেখা তৈরী করে।

xi) আন্তঃলোব গ্রাবরেখা : হিমবাহের প্রান্তদেশ অনেক সময় কতকগুলো উত্তল অংশ ও উহাদের অন্তর্বর্তী দীর্ঘাকৃতি খাঁজ দ্বারা গঠিত হয়। এরূপ খাঁজে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হয়ে শৈল শিরার মতো আন্তঃলোব গ্রাবরেখার সৃষ্টি করে।

xii) ওয়াশ বোর্ড গ্রাবরেখা : কোনো কোনো অঞ্চলে যেমন উত্তর দক্ষিণ ডাকোটার পূর্বাংশে গ্রাবরেখা গঠিত অনেকগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত নিম্ন ও সংকীর্ণ শৈলশিরা দেখা যায়। এদের কে ওয়াশ বোর্ড গ্রাবরেখা বলে। এরা উচ্চতায় সাধারণত ১০-৫০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে কয়েক হাত থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এদের মধ্যে কয়েকশ ফুট ব্যবধান থাকে।

xiii) খাত কাটা গ্রাবরেখা : যদি হিমবাহের তলদেশে সুবৃহৎ গন্ডশিলা প্রোথিত থাকে তাহলে ঐ প্রোথিত গন্ড শিলার পশ্চাৎ ভাগে (নিম্ন প্রবাহের দিকে) বরফের চাপ কম থাকে ও ঐ গন্ড শিলার পরবর্তী অংশে যেখানে দ্বিধাবিভক্ত বরফ মিলিত হতে যায় সেখানে পার্শ্ববর্তী

অংশে বরফের চাপ বেশি থাকে। এর ফলে টিলা নিষ্পেষিত হয়ে শিরার আকার ধারণ করে। এ শিরার সম্মুখভাগে (ঊর্ধ্ব উপত্যকার দিকে) একটা খাতে সৃষ্টি করে। এরূপ গ্রাবরেখাকে খাতকাটা গ্রাবরেখা বলে।

xiv) রোজেন গ্রাবরেখা : রোজেন গ্রাবরেখা হিমবাহ প্রবাহের আড়াআড়ি দিকে শিরার আকারে অবস্থান করে। এরা উচ্চতায় ১০ মি. থেকে ৩০ মি. এবং দৈর্ঘ্যে ১ কি. মি. বেশী হয়। দুটি রোজেন গ্রাবরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ১০০-৩০০ মি. থাকে। এই গ্রাবরেখা শিরার আকৃতি অনেকটা চাঁদের কলার মতো যার শিং নিম্ন উপত্যকার দিকে প্রসারিত থাকে। সুইডেনের রোজেন হ্রদে এরকম সুগঠিত রোজেন গ্রাবরেখা লক্ষ্য করা যায়, যা থেকে এই ধরনের গ্রাবরেখার নামকরণ হয়েছে।

xv) পশ্চাদগামী গ্রাবরেখা : দেখা গেছে হিমযুগে হিমবাহের পর্যায়ক্রমে অগ্রগমন ও পশ্চাৎ অপসরণ ঘটেছে। এইরূপ অবস্থায় পশ্চাৎ অপসারণকালে যদি হিমবাহ মাঝে মধ্যে কোনো এক সময়ে স্থিতাবস্থায় প্রাপ্ত হয় তাহলে একাধিক প্রান্ত গ্রাবরেখার সৃষ্টি হয়। এদেরকে পশ্চাদগামী গ্রাবরেখা বলে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ পূর্ব কথিত কোনো কোনো প্রান্ত গ্রাবরেখা হিমবাহের পুনবাহের পুনরাগমনের ফলে হয়ে থাকে।

২) ড্রামলিন (Drumlin) :

অনেক সময় হিমবাহের সাথে প্রবাহিত প্রস্তরখন্ড, কাঁকর, বালুকা, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত

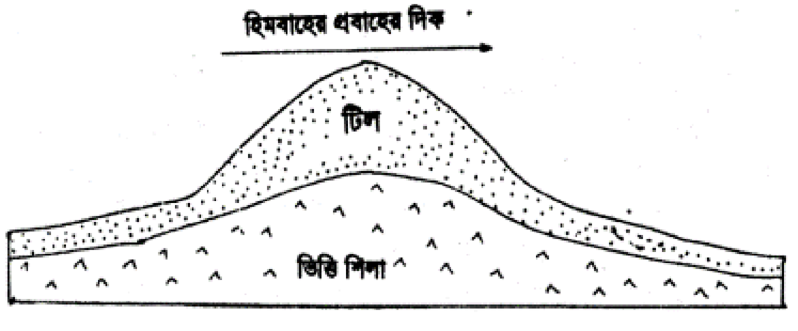

চিত্র ৫.১৩.২ : ড্রামলিন

হয়ে সারিবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা পাহাড়ের সৃষ্টি করে। এরা হিমবাহের গতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে এবং দেখতে অনেকটা উল্টানো নৌকা বা উল্টানো চামচের মতো হয়। যে দিক থেকে হিমবাহ প্রবাহিত হয় তাদের সেদিক হয় তাদের সেদিক ভোঁতা এবং অন্যদিক বেশ ঢালু। এ রকম ভূমিরূপকে ড্রামলিন বলা হয় (চিত্র-৫.১৩.২। কোনো কোনো ড্রামলিন অর্ধ বা সোয়া মিটার উঁচু এবং বৃত্তাংশটি কয়েক মিটার লম্বা হয়। উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ইউরোপের উত্তরাংশে এরূপ ড্রামলিন দেখতে পাওয়া যায়।

৩) অনিয়মিত শিলাপিন্ড (Erratic Block) :

হিমবাহের সাথে অনেক সময় অনেক বড় বড় শিলাপিন্ড সমতল ভূমিতে এসে পড়ে। এরূপ বৃহৎ আকৃতির প্রস্তরখন্ডগুলো একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী যখন অবস্থান করে তখন তাদের অনিয়মিত শিলাপিন্ড বলা হয়। এদের অধিকাংশই অত্যন্ত কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত।

৪) হিমবাহ সমভূমি (Glacial Plain) :

অনেক সময় হিমবাহের গতিপথে বা এর শেষ প্রান্তে অবস্থিত হ্রদসমূহে এর দ্বারা বাহিত কাঁকর, বালু, কাদা, প্রস্তরখন্ড ইত্যাদি দ্বারা ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে হিমবাহ সমভূমি বলা হয়। উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের আগাসিস হ্রদটিও ভরাট হয়ে এ জাতীয় সমভূমিতে পরিণত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. ক্ষয়জাত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে .... হয়ে অবশেষে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতির সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।

১.২. উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের .... চিহ্নই অধিক দেখতে পাওয়া যায়।

১.৩. যে ভূমির ওপর দিয়ে হিমবাহ চলতে থাকে সে ভূমিতে যে গ্রাবরেখা গঠিত হয় তাদের .... গ্রাবরেখা বলে।

১.৪. হিমবাহের উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত করে ....গ্রাবরেখা গঠন করে।

১.৫. দুদিক থেকে দুটি হিমবাহ এসে এক স্থানে মিলিত হলে উভয়ের মধ্যস্থানে যে গ্রাবরেখা গঠিত হয় তাকে ....গ্রাবরেখা বলে।

১.৬. হিমবাহের দ্বারা নীত পদার্থ হৈমবাহিক উপত্যকার শেষভাগে স্তুপের মতো সঞ্চিত হলে একে ......গ্রাবরেখা বলে।

১.৭. .... গ্রাবরেখা হিমবাহ প্রবাহের আড়াআড়ি দিকে শিরার আকারে অবস্থান করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১) হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় সেগুলো নাম লিখুন।

২) গ্রাবরেখা কি? কত ধরনের গ্রাবরেখার কথা এই অধ্যায় বলা হয়েছে সেগুলোর নাম লিখুন।

৩) স্তরীভূত সঞ্চাত ও অস্তরীভূত সঞ্চাত বলতে কি বোঝায়?

৪) হিমবাহের সঞ্চয়জাত ৫টি ভূমিরূপ উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১) হিমবাহের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহ আলোচনা করুন।

২) টিকা লিখুন :
(ক) হিমরেখা, (খ) হিমশৈল, (গ) সার্ক, (ঘ) ইউ-আকৃতি উপত্যকা, (ঙ) তুষার, (চ) হিমবাহ, (ছ) ঝুলন্ত উপত্যকা, (জ) গ্রাবরেখা, (ঝ) প্রান্ত গ্রাবরেখা, (:) ফিয়র্ড (ট) হিমবিধৌত সমভূমি, (ঠ) ড্রামলিন ও (ড) পিরামিডীয় শৃঙ্গ।

পাঠ-৫.১৪

হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয়
Fluvio-Glacial Deposits

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় দ্বারা গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

অনেক সময় হিমবাহ গলিত পানি ধারা বালু, কর্দম, কাঁকর প্রভৃতি বহুদূর পর্যন্ত বহন করে থাকে। এ সকল পদার্থ পরে অসমানভাবে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠন করে। এ জাতীয় ভূমিরূপ স্তরে স্তরে গঠিত হয় বলে এদের হিমবাহের স্তরীভূত সঞ্চয়ও (Stratified Deposit) বলা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে হিম বিধৌত সমভূমি, এস্কার, কেম ও কেম সোপান, ভ্যালিট্রেন, ভার্ব প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়।

হিমবাহ গলিত পানি ধারা সঞ্চিত ভূমির-রূপ যেমন- হিমবেধৌত সমভূমি, এস্কার, কেম ও কেম সোপান, ভ্যাটিট্রেন, ভার্ব ইত্যাদি।

১) **হিমবিধৌত সমভূমি (Glacial Outwash Plain) :** অনেক সময় হিমবাহ গলিত পানি ধারা সূক্ষ্মতর পদার্থগুলোকে হিমবাহিক উপত্যকার বাইরে পাখার ন্যায় সঞ্চিত হয়। এরূপ পাখার ন্যায় সমভূমিকে হিমবিধৌত সমভূমি বলা হয়। এদের উপরিভাগ সাধারণত অসমান থাকে। বরফের প্রান্তদেশের নিকট বৃহদাকৃতির প্রস্তরখন্ড এবং প্রান্তদেশ থেকে দূরে সূক্ষ্ম কণা সঞ্চিত হয়ে থাকে। একে আউটওয়াশ বলে (চিত্র-৫.১৪.১)। এই সূক্ষ্ম আউটওয়াশের মধ্যে অনেক সময় বরফের টুকরা থেকে যায় এবং পরে বরফ গলে ঐ অংশটি অবনমিত হয়ে গর্তের সৃষ্টি করে। এভাবে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তযুক্ত আউটওয়াশকে কেটলিহোল বা গর্ত (Kettle-hole) বলা হয়।

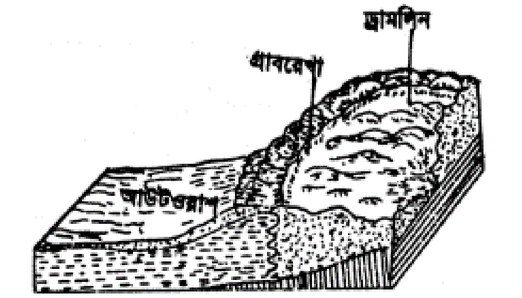

চিত্র ৫.১৪.১ : গ্রাবরেখার, ড্রামলিন এবং আউট ওয়াস

২) **এস্কার (Esker) :** হিমবাহ-বাহিত প্রস্তর, কাঁকর, বালি প্রভৃতি নিম্নে বরফ-গলিত পানি ধারার মাধ্যমে যে সকল অঞ্চলে সঞ্চিত হয়, সেখানে প্রস্তরখন্ড (Gravel) ও বালির দ্বারা গঠিত আঁকাবাঁকা শৈলশিরা (Sinuous Ridges) গঠিত হতে দেখা যায় একে এস্কার বলে। এরা সাধারণত ৫০-৯০ মি. উঁচু, ৮-২৪ কি.মি. লম্বা এবং কয়েকশ মিটার প্রশস্ত হয়। এস্কার হিমবাহের তলদেশে বা পার্শ্বে গঠিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এটাই হিমবাহিক অঞ্চলের যাতায়াত পথরূপে ব্যবহৃত হয়। ফিনল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রচুর এস্কার দেখতে পাওয়া যায়।

৩) **কেম (Kame-hole) :** কখনও কখনও হিমবাহের শেষ প্রান্তে ধীরে ধীরে পলি সঞ্চিত হয়ে কোনাকৃতি ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। হিমবাহ গলিত পানি স্রোতের দ্বারা গঠিত এরূপ ব-দ্বীপকে কেম বলে। হিমবাহের মধ্যস্থিত ফাটলে প্রবাহিত জলধারা সঞ্চয়ের ফলে শৈলশিরার মতো কেম সৃষ্টি হতে পারে। এদেরকে ক্রিভাস কেম (Crevasse Kame) বলে। এটি অনুরূপভাবে গঠিত এস্কারের সমগোত্রীয় পর্যায়ে পৌছায়। তবে সাধারণত এস্কারের দৈর্ঘ্য বেশী থাকে। কেম সঞ্চিত হয়ে হিমবাহিক উপত্যকার উভয় পাশে সমতল সোপানের ন্যায় যে ভূ-ভাগের সৃষ্টি হয় তাকে কেম সোপান (kame Terrace) বলে।

৩) **ভ্যালি ট্রেন (Valley Train) :** পার্বত্য উপত্যকায় অনেক সময় আউটওয়াশ-এর বালু, কর্দম প্রভৃতি গ্রাবরেখারও নিচে প্রবাহিত হয়ে উপত্যকার নিম্নাংশে প্রসারিত হয়। এটি

অনেক সময় নদীর দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন ও হয়। এরূপ ব্যবচ্ছিন্ন আউটওয়াশকে ভ্যালি ট্রেন বলে।

৩) ভার্ব (Varve) :

আউটওয়াশ-এর অতি সূক্ষ্ম অংশগুলো অনেক সময় প্রান্তীয় হিমহ্রদে (Proglacial lake) পতিত হয়। পরে তা পানির তলদেশে সঞ্চিত হয়ে ভার্ব-এর সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মকালে হিমবাহের গলনের ফলে নদীর ক্ষয় দ্রুত হয় এবং তখন হ্রদের পানিতে সূক্ষ্ম পলি (Silt) এবং কর্দম (Clay) উভয়ই চলে আসে। পলি পানির তলদেশে দ্রুত সঞ্চিত হয় বটে কিন্তু কর্দম বহুদিন ধরে পানির তলায় সঞ্চিত হয়। ফলে ভার্ব-এ একটি সূক্ষ্ম এবং একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল স্তর দেখা যায়। এ দুটি স্তর যথাক্রমে হালকা ও গাঢ় রং দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং এ দুটি স্তর একটি বছরের সঞ্চয়কে নির্দেশ করে। সুইডেনে হ্রদে সঞ্চিত ভার্ব-এর স্তর গণনা করে প্লাইস্টোসিন যুগের বয়স গণনা করা সম্ভব হয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ :

হিমবাহ দুভাবে সঞ্চয়কার্য করে থাকে। প্রথমটি হলো হিমবাহ নিজেই কাঁকর, প্রস্তরখন্ড, বালু, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চয় করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিমগলিত পানি ধারা নানা প্রকার পদার্থ সঞ্চয় করে। প্রথমটিকে বলা হয় (ক) হিমবাহের সঞ্চয় (Glacial Deposits) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় (খ) হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় (Fluvio-Glacial Deposits)। হিমবাহ দ্বারা জমাকৃত তলানিতে কোনো স্তর থাকে না এ জাতীয় সঞ্চয়কে অস্তরীভূত সঞ্চাত (Unstratified Drift) বলে। হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় দ্বারা যে ভূমিরূপের উদ্ভব হয় তাতে স্তর থাকায় ঐ ধরনের সঞ্চয়কে স্তরীভূত সঞ্চাত (Stratified Drift) বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূন্যস্থানপূরণ করুন :

১.১. পাখার ন্যায় সমভূমিকে .... সমভূমি বলা হয়।

১.২. .... সাধারণত ৫০-৯০ মি. উঁচু. ৮-২৪ কি. মি. লম্বা এবং কয়েকশ মিটার প্রশস্ত হয়।

১.৩. কখনও কখনও হিমবাহের শেষ প্রান্তে ধীরে ধীরে পলি সঞ্চিত হয়ে কোনাকৃতি ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়, এরূপ ব-দ্বীপকে .... বলে।

১.৪. ব্যবচ্ছিন্ন ....কে ভ্যালি ট্রেন বলে।

১.৫. সুইডেনে হ্রদে সঞ্চিত ভার্ব-এর স্তর গণনা করে........... যুগের বয়স গণনা করা সম্ভব হয়েছে।

১.৬. এভাবে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তযুক্ত আউটওয়াশকে .... বা গর্ত (Kettle-hole) বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১. সংজ্ঞা দিন

হিমবিধৌত সমভূমি, এস্কার, কেম, ভ্যালি ট্রেন, ভার্ব।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. হিমবাহ গলিত পানি ধারার সঞ্চয় দ্বারা গঠিত ভূমিরূপ-এর বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.১৫

বায়ু ও বায়ুর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
Wind and its Erosional Land forms

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- শুষ্ক ও শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনে বায়ুর প্রধান্যের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের মরুভূমির ভৌগোলিক বন্টন বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন; এবং
- শুষ্ক মরু অঞ্চল ও আর্দ্র অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন।

শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর কাজ ভূমিরূপ সৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব অর্জন করে। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন,

প্রথমত: আর্দ্র অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাতের জন্য মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত ভিজে থাকে ও মৃত্তিকা কণা পানির দ্বারা দৃঢ় সংঘবৃদ্ধ থাকে। ফলে বায়ু মৃত্তিকা বা বিচূর্ণীভূত পদার্থ সহজে অপসারিত করতে পারে না।

কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে মৃত্তিকা বা বিচূর্ণীভূত পদার্থ সহজেই বায়ু অপসারিত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: আর্দ্র অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও শস্যের আবরণ বেশী থাকে। ফলে উদ্ভিদের শিকড় মাটিকে ধরে রাখে, কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলে উদ্ভিদের বিরল আবরণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত আলগা পদার্থ বায়ু সহজেই অপসারিত করতে পারে।

তৃতীয়ত: শুষ্ক অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের অভাবে মাটিতে জৈব পদার্থের সংস্থান কম হয়। এতেও মৃত্তিকা বন্ধনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত: উদ্ভিদ বা অরণ্য, লোকবসতি প্রভৃতির অভাবে মরুভূমিতে বায়ু অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধ বা প্রায় বাঁধাহীন বেগে প্রাবহিত হয়। ফলে বায়ুর অপসারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শুষ্ক ও শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে ভূমিরূপ সৃষ্টিতে বায়ুর কার্যের প্রাধান্যের কারণগুলো নিম্নরূপ:

১) শুষ্ক বিচূর্ণীভূত পদার্থ খুব সহজেই বায়ুর দ্বারা স্থানান্তরিত হয়;
২) মরু অঞ্চলে বিরল উদ্ভিদ আবরণের জন্য বায়ু সহজেই আলগা পদার্থ অপসারণ করতে পারে;
৩) মাটিতে জৈব পদার্থের সংস্থান কম বিধায় মৃত্তিকা বন্ধনে অসুবিধা সৃষ্টি করে ও
৪) উদ্ভিদ ও লোক বসতি না থাকায় বায়ুর অপসারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর মরু অঞ্চলসমূহ (Desert Regions Desert) :

বায়ুর কার্য মরু অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী দেখাতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় ১/৩ অংশ বা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অঞ্চলে মরুরূপে চিহ্নিত। তাছাড়া মেরু ও মেরুবৃত্ত অঞ্চলেও বেশ কিছু অঞ্চল শীতল মরু অঞ্চল (Cold Desert) রূপে অবস্থান করছে।

নিম্ন-অক্ষাংশীয় মরুভূমি (Low-latitude Desert) :

ক্রান্তীয় মরু-অঞ্চলগুলো এর অন্তর্গত, যা অনেক সময় ‘আয়ন বায়ু মরু অঞ্চল (Trade Wind Desert) নামে পরিচিত। এই মরু-অঞ্চল নিরক্ষরেখা থেকে ২০° থেকে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলোর পশ্চিম দিকে অবস্থান করে থাকে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মরক্কো থেকে সাহারা, আরব, বালুচিস্তান, থর মরুভূমি দেখতে পাওয়া যায় তাকে প্রাচীন পৃথিবীর মরু বলয় (Old World Desert Belt) নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে সোনারান মরুভূমি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা ও উত্তর-পশ্চিম মেক্সিকো উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত । দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি সর্ববৃহৎ মরুভূমি। এটি সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থান করছে। দক্ষিণ গোলার্ধে অন্যান্য মরু অঞ্চলগুলো হলো দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি ও

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরুর অন্তর্গত আটাকামা মরুভূমি যা আন্দিজ পর্বতের পশ্চিমে সংকীর্ণভাবে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত (চিত্র-৫.১৫.১)।

মধ্য-অক্ষাংশীয় মরুভূমি (Mid-latitude Desert) :

মহাদেশগুলোর অভ্যন্তরভাগে মধ্য-অক্ষাংশীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (Mid-Temperate Latitudes) পর্বত বেষ্টিত উচ্চ অববাহিক সমূহের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে (Rain Shadow Area) অবস্থান করছে। এশিয়ার গোবি, তাকলামাকান ও তুর্কীস্থানের মরুভূমি এবং উত্তর আমেরিকার কলোরাডো মরুভূমি এর অন্তর্গত।

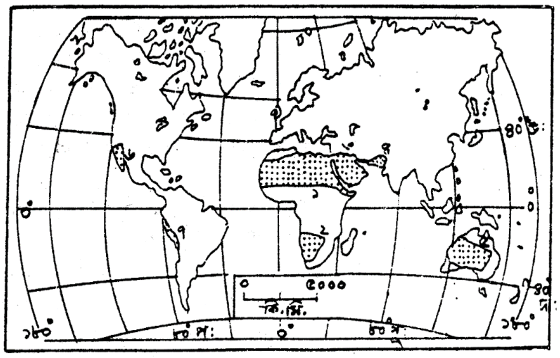

চিত্র ৫.১৫.১ :ক্রান্তীয় মরু অঞ্চসমূহ

শুষ্ক মরু অঞ্চল ও আর্দ্র অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য (Contrasts Between Arid and Humid Regions) :

জলবায়ু ও ভূমিরূপের দিক থেকে শুষ্ক, শুষ্ক প্রায় ও আর্দ্র অঞ্চলের মধ্যে তেমন কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। সাধারণভাবে এটি ধরে নেয়া হয় যে, যেখানো বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ থেকে ২০ ইঞ্চির মধ্যে সে অঞ্চলকে শুষ্ক প্রায় অঞ্চল এবং যে স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ ইঞ্চিরও কম সেই অঞ্চলকে মরু অঞ্চল বলে। তবে আর্দ্র অঞ্চলে প্রধান বৈশিষ্ট্যই পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত।

পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জুড়ে মরু অঞ্চল অবস্থিত।

জলবায়ুর পার্থক্য (Climatic Contrasts) :

মরু অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদের একান্ত অভাব। অধিকাংশ মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য হলো অনিয়মিত বা অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত। কবে, কখন এবং কোন বছর বৃষ্টিপাত হবে তা সঠিকভাবে বলা খুবই দূরূহ ব্যাপার। কিন্তু বৃষ্টিপাত যখন হয় তখন তা অত্যন্ত প্রবলভাবে (Torrential Rain) হয় বটে, তবে এটি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী।

মরু অঞ্চলের জলবায়ুর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো; দৈনন্দিন তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্য (Higher Daily Range of Temperatre)। সম্ভবতঃ মেঘমুক্ত আকাশ এবং আর্দ্রতার ও গাছপালার অভাবের জন্য দিবা ভাগে ভূমিভাগ দ্রুত উত্তপ্ত এবং রাত্রিকালে দ্রুত শীতল হয়ে দৈনিক তাপমাত্রার এক বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-লিবিয়ার ত্রিপলিতে দিনের বেলায় সর্বোচ্চ ৯৯° ফাঃ এবং রাত্রিতে সর্বনিম্ন ৩১° ফাঃ উত্তাপের নজির রয়েছে। বাৎসরিক শীতোষ্ণতার গড় (অর্থাৎ শীতকাল ও বৃষ্টিপাতের অভাব এবং অনিয়মিত বা অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের জন্য উদ্ভিদ মন্ডলীর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য ও গাছপালার অভাবে বিস্তীর্ণ শিলাময় অঞ্চলের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুষ্ক ও শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে মরুদ্যানের ন্যায় কাঁটা ও গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ লক্ষ্য করা যায়।

মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদের একান্ত অভাব।

ভূতাত্ত্বিক পার্থক্য (Geological Differences) :

মরু অঞ্চলে সাধারণত অভ্যন্তরীণ পানি নির্গমন প্রণালী (Internal Drainage Pattern) গড়ে উঠে। তবে কিছু নদী এর ব্যতিক্রম। এরা মরু অঞ্চল অতিক্রম করে সমুদ্রে পতিত হয়। আফ্রিকার নীল নদ ইথিওপিয়ার উচ্চ ভূমি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদী রকি পার্বত্য অঞ্চলের পৃষ্টিপাত দ্বারা পুষ্ট। এই নদীদ্বয় মরু অঞ্চল অতিক্রম করে সাগরে মিলিত হয়েছে। এইরূপ নদীকে বিদেশীয় নদী (Exotic) বলা হয়।

মরু অঞ্চলের কয়েকটি নদী ভিন্ন অধিকাংশ নদী ক্ষুদ্রাকার, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী। এদেরকে সাধারণতঃ ওয়াদি (Wadis) বলা হয়। মরু অঞ্চলের নদীগুলো অধিকাংশ সময়ে শুষ্ক থাকে, যদিও নদীগর্ভের বালু ও নুড়ির অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলারূপে অনেক সময় হয়তো জলস্রোত প্রবাহিত হয়। এই সকল শুষ্ক নদীতে স্থানীয় বৃষ্টিপাতের পরে অনেক সময় হঠাৎ বন্যা দেখা দেয়। বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ ডেভিস (Davis) এগুলোকে নদী না বলে প্লাবনধারা (Stream Floods) বলেছেন। শুষ্ক মরু অঞ্চলে নদীতে যেমন আকস্মিক বন্যা ঘটিত তেমনি আকস্মিক নদীর পানি নেমে যায়। মরু অঞ্চলের ক্ষুদ্র নদীগুলোর ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য।

মরু অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নদী বন্যা (Stream Flood) অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো বিস্তৃত প্লাবন (Sheet Flood) । মরু অঞ্চলে ঝড় ও ঝঞ্ঝার সময় বৃষ্টির পানি আর্দ্র অঞ্চলের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে জালের ন্যায় বিস্তৃত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মধ্য দিয়ে পানির একটি চাদরের (Sheet) ন্যায় বিস্তারিত হয় একে Sheet Flood বা বিস্তৃত প্লাবন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূণ্যস্থানপূরণ করুন :

১.১. শুষ্ক অঞ্চলে মৃত্তিকা বা বিচূর্ণীভূত বা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অঞ্চলে মরুরূপে চিহ্নিত।

১.২. শুষ্ক অঞ্চলে মৃত্তিকা বা বিচূর্ণীভুত পদার্থ সহজেই ....অপসারিত করতে পারে।

১.৩. প্রায় ....অংশ বা শতকরা প্রায় .... ভাগ অঞ্চলে মরুরূপে চিহ্নিত।

১.৪. অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি .... মরুভূমি।

১.৫. অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের শতকরা প্রায় ....ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থান করছে।

১.৬. যে স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ......ইঞ্চিরও কম সেই অঞ্চলকে মরু অঞ্চল বলে।

১.৭. পৃথিবীর প্রায় শতকরা ....ভাগ জুড়ে মরু অঞ্চল অবস্থিত।

১.৮. মরু অঞ্চলের নদীগুলো অধিকাংশ সময়ে .... থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মরু, মরূপ্রায় ও আর্দ্র অঞ্চল বলতে কি বুঝেন?

২. মরু ও মরূপ্রায় অঞ্চলে বায়ু ভূমিরূপ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. শুষ্ক ও শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনে বায়ুর প্রাধান্যের কারণ কি? পৃথিবীর মরু অঞ্চল সমূহের বর্ণনা দিন।

২. শুষ্ক মরু অঞ্চল ও অনার্দ্র অঞ্চলের পার্থক্য কি?

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন মরু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.১৬

বায়ু কার্য
Functions of Wind

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বায়ুর কার্য যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সে সকল বিষয়ে অবগত হতে পারবেন এবং
- বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন।

নদী ও হিমবাহের ন্যায় বায়ুর কার্যকেও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-
(১) ক্ষয়কার্য, (২) বহন কার্য এবং (৩) সঞ্চয় কার্য।

বায়ুর ক্ষয়কার্য (Wind Erosion) :
বায়ু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকারেই ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে। বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন (O_2) ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস আছে তার সাথে রাসয়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হয়ে ধুলিকণায় পরিণত হয়। আবার কঠিন পদার্থসমূহ প্রবল বায়ু প্রবাহ দ্বারা প্রবাহিত হয়ে শিলায় ঘর্ষণ ও আঘাত করে। ফলে শিলাস্তর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বায়ুর ক্ষয়ক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠের সন্নিকটেই সর্বাপেক্ষা বেশী কিন্তু ওপরদিকে ক্রমেই কম। বায়ুর ক্ষয়সাধন নিম্নের তিনটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যথা-

বায়ুর কার্য তিনটি যেমন-ক্ষয়কার্য, বহনকার্য ও সঞ্চয় কার্য।

১) **ঘর্ষণ (Abrasion) :** শুষ্ক অঞ্চলে প্রবল বায়ু প্রবাহের সাথে অনেক সময় কঠিন বালুকণাসূমহ প্রবাহিত হয়। ফলে এদের ঘর্ষণে শিলারাশি ক্ষয় হতে থাকে। বায়ু প্রবাহের এরূপ ঘর্ষণ কার্যের দরুন ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বহু গর্তের সৃষ্টি হয় বলে একে বায়ুর ভূ-ক্ষয় (Attrition) বলা হয়।

২) **অবঘর্ষ (Corrasion) :** প্রবল বায়ু প্রবাহের সাথে কর্কশ বালুকণা থাকলে ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী ক্ষয় হয়। এইরূপ ক্ষয়ক্রিয়াকে অবঘর্ষ বলে। কর্ষণের দ্বারা শিলা ধীরে ধীরে এবং কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয় হয়।

৩) **অবনমন (Deflation) :** অনেক সময় বায়ু ভারী পদার্থ ত্যাগ করে কেবল হালকা ধুলা ও বালি বহন করে। বায়ু প্রবাহের এ প্রকার ক্রিয়াকে অবনমন বলে। এরূপ ক্রমাগত অবনমনের ফলে মরু অঞ্চলের নিম্নভূমি ও গর্তের সৃষ্টি হয়।

বায়ুর বহন কার্য (Transportation by wind) :
বায়ু প্রধানতঃ সূক্ষ্ম বালু ও ধুলিকণাকে দূর দেশে বহন করে থাকে। ভূমি থেকে সম্ভবতঃ ২ মিটার উচ্চতার মধ্যেই অধিকাংশ বালু ও ধুলিকণা বাহিত হয়ে থাকে। ব্যাগনল্ড-এর মতে বায়ুর এই বননকার্য তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন-(ক) ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension), (খ) লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltayion), এবং (গ) ভূমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পতন (Surface Creep)।

(ক) ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension) -: বাতাসে ভাসমান অবস্থায় অধিক বালু বাহিত হতে পারে না। কারণ বালুকণাকে ওপরে ওঠার গতিবেগ বা শক্তি (Vertical Velocity) বাতাসের বেশি থাকে না। তাছাড়া বাতাসের গতিও (Wind Velocity), সব সময় একই রকম থাকে না। বাতাস অতি সূক্ষ্ম ধুলিকণাকে দূর দেশে বহন করলেও বালু কণাকে অধিক দূরে বহন করতে পারে না।

(খ) লক্ষ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltation) : লক্ষদান প্রক্রিয়ায় বাতাসে বাহিত বালু কণা প্রস্তরখন্ডে ধাক্কা খেয়ে পুনরায় পিছনে কিছুটা ফিরে আসে (Rebound of Wind-Driven Sand) এবং পুনরায় বাতাসের গতিতে কিছুটা সম্মুখে এগিয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় বাতাস অধিকাংশ বালু বহন করে থাকে এবং এ প্রক্রিয়া বালু কণার ওপর বায়ু চাপের (Wind Pressure) পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

(গ) ধীর গতিতে পতন (Surface Creep) : বায়ুর দ্বারা বাহিত বালুকণা সম্মুখে অবস্থিত প্রস্তরখন্ডে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে লক্ষদান প্রক্রিয়ায় সামান্য পিছনের দিকে ফিরে আসে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কিছু পরিমাণে শক্তি থেকে যায়, যা বালুকণাকে ভূমির ওপর দিয়ে অতি ধীর গতিতে সম্মুখে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে (Surface Creep) ।

পাঠসংক্ষেপ :

নদী ও হিমবাহের ন্যায় বায়ুর কার্যকেও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন- (১) ক্ষয়কার্য, (২) বহন কার্য এবং (৩) সঞ্চয় কায। বায়ু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকারেই ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে বায়ুর ক্ষয়সাধন নিম্নের তিনটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যথা-ঘর্ষণ, অবঘর্ষ ও অবনমন। বায়ু প্রধানতঃ সূক্ষ্ম বালু ও ধুলিকণাকে দূর দেশে বহন করে থাকে। ব্যাগনল্ড-এর মতে বায়ুর এই বহনকার্য তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন- (ক) ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension), (খ) লক্ষ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltation), এবং (গ) ভূমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পতন (Surface Creep)।

পাঠোত্তরমূল্যায়ন ৫.১৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. **শূণ্যস্থান পূরন করুন :**

১.১. বাতাসে ভাসমান অবস্থায় অধিক বালু ...... হতে পারে না।

১.২. .... অঞ্চলে প্রবল বায়ু প্রবাহের সাথে অনেক সময় কঠিন বালুকনাসমূহ প্রবাহিত হয়।

১.৩. প্রবল বায়ু প্রবাহের সাথে কর্কশ বালুকণা থাকলে ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী ...... হয়।

১.৪. ক্রমাগত অবনমনের ফলে মরু অঞ্চলের নিম্নভূমিও ....সৃষ্টি হয়।

১.৫. ভূমি থেকে সম্ভবতঃ ....মিটার উচ্চতার মধ্যেই অধিকাংশ বালু ও ধুলিকণা বাহিত হয়ে থাকে।

১.৬. বাতাসে ভাসমান অবস্থায় অধিক বালু ....হতে পারে না।

১.৭. বায়ু যান্ত্রিক ও .....উভয় প্রকারেই ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বায়ুর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়াগুলো কি কি?

২. বায়ুর বহন কার্যের প্রক্রিয়াগুলো ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বায়ুর কার্য কত প্রকার? বায়ুর ক্ষয় ও বহন কার্যের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫.১৭

বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফল
Result of Wind Erosion

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন;
- বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন।

প্রবল বায়ু প্রবাহ মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই বায়ু প্রবাহের দ্বারা মরু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বালুকা ও ধুলিকণা অপসারিত হয়ে বহু গর্ত বা নিম্নভূমির সৃষ্টি করে। বায়ু দ্বারা চালিত বহু কাঁকর, বালুকণা প্রভৃতির ঘর্ষণে ও আঘাতে শিলার ওপর বহু আঁচল ও গভীর দাগের সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত কোমল শিলা স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় এবং যে সকল অঞ্চলে বায়ু একই দিক থেকে সারা বছর প্রবাহিত হয় তথায় বায়ুর প্রবাহ জনিত ক্ষয়সাধন প্রবল হয়। বায়ুর ক্ষয় ক্রিয়ার ফলে নানা ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। যেমন, বিভিন্ন ধরনের মরুভূমি বা মরু অঞ্চলের দৃশ্য, গৌর, ইয়ার্ডাঙ্গা, ইনসেলবার্গ, জুগেন, ভেন্টিফ্যাক্টস, শিলায়িত সমভূমি ও অগভীর হ্রদ। এ সকল ভূমিরূপের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

১) **নানা ধরনের মরুভূমি বা মরু অঞ্চলে দৃশ্য (Different Kinds of Deserts or Desert Landscape) :**

(ক) **শিলায়িত মরুভূমি (Rocky Desert) :** এ প্রকার মরুভূমি বায়ু প্রবাহের অবনমন ও ঘর্ষণ ক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়েছে। প্রথমে প্রবল বায়ু প্রবাহের দ্বারা বালুকা অপসারিত হয় পরে ঘর্ষণ ক্রিয়ার ফলে শিলারাশি মসৃন হয়। এজন্য এরূপ মরুভূমিতে অনেক সময় বালুকার চিহ্নও থাকে না। এ জাতীয় মরুভূমি হামাদা (Hamada) নামেও পরিচিত।

চিত্র-৫.১৭.১ : গৌর

(খ) **প্রস্তর মরুভূমি (Stony Desert) :** এ জাতীয় মরুভূমি ভাসমান। এতে মসৃণ পাথরের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে থাকে। এটাও বায়ুর অবনমন ও ঘর্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়েছে। বায়ুর অধিক অবনমনের ফলে এ অঞ্চলে বালুকা ও ধুলিকণা অপসারিত হয় এবং পাথরের টুকরা পড়ে থাকে। আলজিরিয়া, লিবিয়া ও মিশরে এ প্রকার মরুভূমি আছে।

(গ) **বালুকাময় মরুভূমি (Sandy Desert) :** সাধারণত বায়ু প্রবাহের অবনমনের (Deflation) দ্বারা এ জাতীয় মরুভূমি গঠিত হয়। বায়ু প্রবাহের ফলে হালকা ধুলিকণা অন্যত্র অপসারিত হয় কিন্তু বালুকণার কোনো অপসারণ হয় না। ফলে এ প্রাকার

মরুভূমিতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমান্তরাল বালুকা স্তর দেখা যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ বালিয়াড়ির জন্য এরূপ ভূমিরূপ তরঙ্গ সংকুল বিশাল বালুকা সমুদ্রের মতো দেখায়। সাহারার এর্গ (Erg) ও তুর্কিস্তানের কউম (Kaum) বালুকাময় মরুভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২) **গৌর (Gour) :** বায়ুর ঘর্ষণ (অনৎধংরড়হ) নির্ভর করে প্রধানত বায়ুর বেগ ও বায়ু মধ্যস্থিত ধুলিকনার পরিমাণ এর উপর। ব্যাগনল্ডের পর্যবেক্ষণ অনুসারে দেখা যায় যে, ১ মিটারের বেশী উঁচুতে বায়ু খুব কম পরিমাণে বালি উত্থিত করতে পারে। এরূপ অবস্থায় দেখা গেছে যে, ভূমি থেকে ১ মিটার উর্ধ্বে বায়ুর মধ্যে বালুকণা কম থাকে বলে ঘর্ষণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

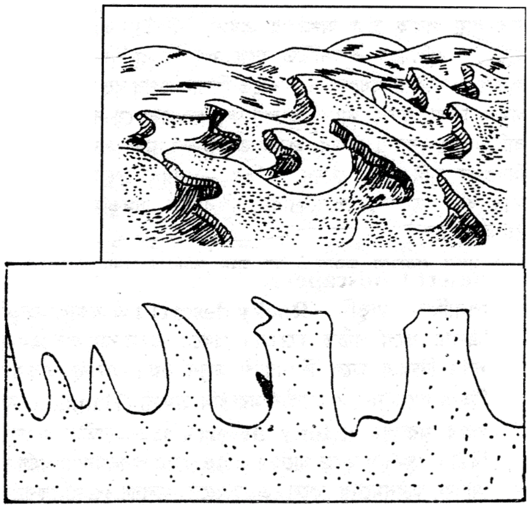

চিত্র-৫.১৭.২ : ইয়ার্ডাঙ্গ

আবার ভূমি দেশে বায়ুর বেগ ভূমিঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হয়। ফলে এ অংশে বালির পরিমাণ বেশী থাকলেও ঘর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। উপরোক্ত দুই অঞ্চলের অন্তবর্তী অংশে অর্থাৎ ভূমি থেকে ১ মিটারে মধ্যবর্তী অংশে বায়ুতে বালির পরিমাণ ও বেগ উভয়েই যথেষ্ট বেশী থাকে। এ জন্য এই অংশে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। অনেক সময় সাহারা মরুভূমিতে শিলাস্তর অসমানভাবে ক্ষয় হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে তার নিচের অংশ খুব সরু অথচ উপরের দিকে সেই তুলনায় বেশ চওড়া হয়। ব্যাঙের ছাতার মতো আকৃতি বিশিষ্ট এরূপ শিলাস্তর বা মুর্তিকে গৌর বলা হয় (চিত্র-৫.১৭.১)। শুষ্ক বা প্রায় শুষ্কময় অঞ্চলে এরূপ বহু গৌর বা প্রায় শুষ্কময় অঞ্চলে এরূপ বহু গৌর গঠিত হলে অনেক সময় এদেরকে স্তম্ভমূল শিলা (Pedestral rock) বলে।

৩) **ইয়ার্ডাঙ্গ (Yardang) :** কোন কোন সময় মরু অঞ্চলে পরস্পর লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কঠিন ও কোমল শিলাস্তরগুলো বায়ু প্রবাহের দিকে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থান করে। প্রচন্ড সূর্য তাপে এসব শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হলে এসব ফাটলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে ক্ষয় করতে শুরু করে। এতে কোমল শিলাস্তর

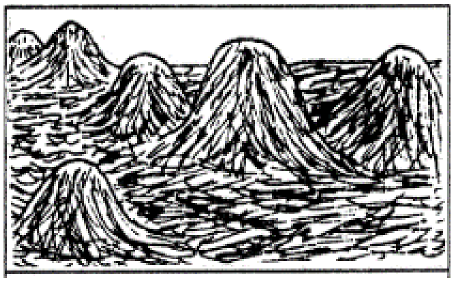

চিত্র-৫.১৭.৩ : ইনসেলবার্জ

সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কেবলমাত্র কঠিন শিলাস্তরগুলো বায়ু প্রবাহের দিকে উঁচু ও খাড়া অসমান পাঁজরের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে প্রায় সমান্তরালে অবস্থান করে। এদের ইয়ার্ডাঙ্গ (চিত্র-৫.১৭.২) বলা হয়। এটির উচ্চতা ভূমিভাগ হতে প্রায় ৭ মিটার এবং ১০ থেকে ৪০ মিটার পর্যন্ত চওড়া হয়। একটি ইয়ার্ডাঙ্গা ভূমি ভাগের গর্ত দ্বারা অপর একটি ইয়ার্ডাঙ্গ হতে পৃথক থাকে। পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে এরকম ভূমিরূপ দেখা যায়।

৪) **ইনসেলবার্জ (Inselberg)** : মরু অঞ্চলে ধূলা বালি ইত্যাদি অপসারণের ফলে বহু অবনমিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলাখন্ড ক্ষয়কার্য প্রতিরোধ করে উঁচুতে ক্ষয়জাত পর্বতরূপে অবস্থান করে। এরূপ পর্বতকে ইনসেলবার্জ বলে। কালাহারি মরুভূমি এবং অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে এ ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষয়কার্য চলতে থাকলে এরা ছোট ছোট টিলার আকার ধারণ করে (চিত্র-৫.১৭.৩)।

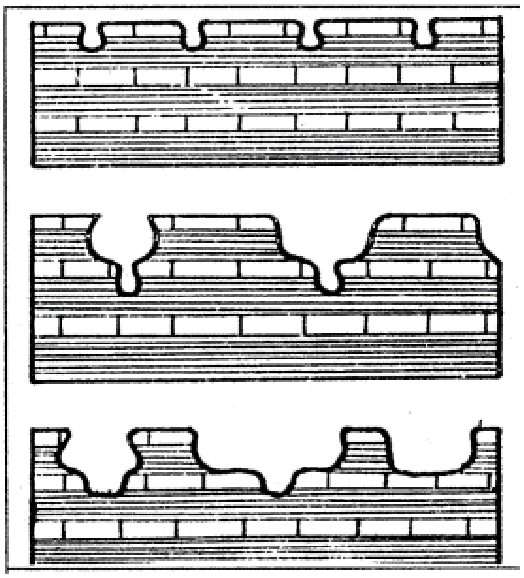

চিত্র-৫.১৭.৪ : জুগেন গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

৫) **জুগেন (Zeugen)** : অনেক সময় মরু অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলাখন্ডের নিচে কোমল শিলা থাকে। দিনে প্রখর সূর্যতাপ এবং রাত্রে শৈত্যের জন্য শিলাস্তরের প্রসারণ ও সংকোচন হয়। এতে ওপরের কঠিন স্তরে বহু ফাটলের সৃষ্টি হয়। বায়ুর ক্রমাগত অবনমনও ঘর্ষণের ফলে ফাটলের মধ্যে দিয়ে শিলা খুবই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু নিচের কোমল শিলা অবনমনের দ্বারা দ্রুত অপসারিত হয়। এভাবে ওপরের অংশে চাপা ও সরু হয়েও নিচের দিক চওড়া হয়ে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে জুগেন বলে (চিত্র-৫.১৭.৪)। এর উচ্চতা সাধারণত ৩৫ মিটার পর্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকার সোলেরান মরুভূমি অঞ্চলে এ ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়।

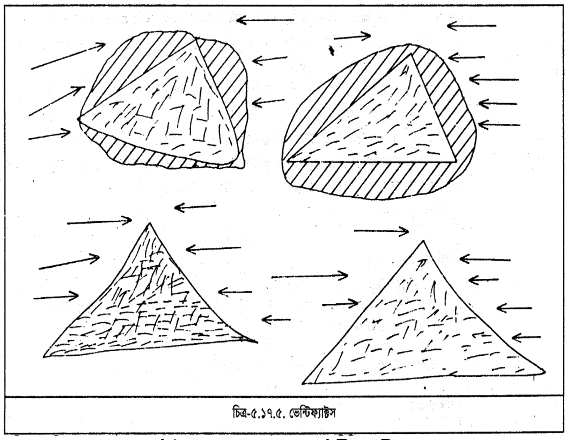

চিত্র-৫.১৭.৫ : ভেন্টিফ্যাক্টস

৬) **ভেন্টিফ্যাক্টস ও ড্রিকান্টার (Ventifacts and Dreikanter)** : কখনো কখনো মরুময় শুষ্ক অঞ্চলে কঠিন শিলাখন্ডগুলো ইতস্তত‌ভাবে পড়ে থাকে। বায়ু যখন একই দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তখন তার ঘর্ষণে সেদিকে মসৃন হয়। পরে আবার বায়ুর দিকে পরিবর্তিত হলে অপর দিকও ক্ষয় হয়ে মসৃন হয়। এরূপে বায়ুর ঘর্ষণে শিলাখন্ডগুলোর ওপরে কয়েকটি সমপৃষ্ঠের (Flat Surface) সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে শিলার সব পৃষ্ঠগুলো একে অপরের সাথে অনেকটা কোণ করে মিলিত হয়। এরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখন্ডগুলোকে ভেন্টিফ্যাক্টস বলে (চিত্র-৫.১৭.৫)। সাধারণত মরুময় অঞ্চলের কোণাকৃতি শিলাখন্ডগুলো ভেন্টিফ্যাক্টস নামে পরিচিত। তবে একাধিক তল

বিশিষ্ট প্রস্তরখন্ডকে ড্রিকান্টার বলে। তবে সব সময় শিলাপৃষ্ঠ খুব মসৃন হয় না। কালাহারি মরুভূমিতে এ জাতীয় শিলাখন্ড অধিক দেখা যায়।

৭) **শিলাময় সমভূমি ও অগভীর হ্রদ :** বায়ুর দ্বারা ক্ষয়ীভবনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অনেক স্থানে শিলাময় সমভূমির সৃষ্টি হয়। ভারত, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের শিলাময় মরুভূমি এভাবে গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শুষ্ক অঞ্চলে বালুকা অপসারিত হয়ে বহু অগভীর হ্রদের সৃষ্টি হয়। কলোরাডো, মনটানা, পশ্চিম নেব্রাসকা শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে এ প্রকার অসংখ্য হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

৮) **গৌণ অবয়ব (Minor Features) :** অনেক সময় অবঘর্ষের ফলে শিলা প্রাচীরের গায়ে গর্তের বা খাঁজের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি কোনো ভৃগুতটের পাদদেশে এরূপ গর্তের সৃষ্টি হয় তাকে বায়ু গহ্বর বলে। তবে অবঘর্ষের সঙ্গে বৈষম্যমূলক বিচুর্নীভবন, সঞ্চালন এবং বৃষ্টিধৌত ক্রিয়া সম্মিলিত ভাবে ক্রিয়া করে এগুলো সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়।

৯) **সঞ্চালন গর্ত :** সাধারণত সমতল মরুভূমি অঞ্চলে এরূপ গর্ত লক্ষ্য করা যায়। এরা আয়তনে কয়েক বর্গ কি.মি. থেকে পশ্চিম মিশরের মরুভূমিতে অবস্থিত ৩২০০ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত ও সমুদ্রতল থেকে ১৩৪ মি. নিম্ন কাতারা অবনত ভূমির ন্যায় বৃহদায়তন হতে পারে। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে প্রাপ্ত পদার্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় অপসারণের ফলে সঞ্চালন গর্তের সৃষ্টি হয় বলে অনুমান করা যায়।

১০) **অবশেষাংশ সঞ্চয় :** সঞ্চালনের ফলে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পদার্থ অপসারিত হয় ও স্থূল প্রস্তর খন্ডগুলো পড়ে থাকে। এরূপ শিলাখন্ডের (নুড়ি, গন্ড শিলা ইত্যাদি) মূল অংশকে অবশেষাংশ সঞ্চয় বলে। মরুভূমিতে স্থানীয় ভাবে এটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। অনেক সময় একে মরুভূমি সড়ক (Desert Pavement) বলে। এরূপ প্রস্তরখন্ড সমন্বিত মরুভূমি অঞ্চলকে সাহারায় (Reg) বা লিবিয়ায় সেরির (Serir) বলে। বালুকাময় মরুভূমিকে আর্গ (Erg) বলে।

পাঠসংক্ষেপ :

শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর কাজ ভূমিরূপ গঠনে অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব অর্জন করে। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ অঞ্চল মরুরূপে চিহ্নিত। তাছাড়া মেরু ও মেরুবৃত্ত অঞ্চলেও বেশ কিছু অঞ্চল শীতল মরু অঞ্চল রূপে অবস্থান করছে।

মরু অঞ্চলে ভূমিরূপ পরিবর্তনে বায়ু প্রবাহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বায়ুর কাজ তিনটি। যেমন-অবঘর্ষ, কর্ষণ ও অবনমন। বায়ুর বহন কার্য তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যথা- (১) ভাসমান অবস্থায় বহন, (২) লম্ফদান অবস্থায় বহন (৩) ও ভূমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে বহন।

বায়ুর ক্ষয় ক্রিয়ার ফলে নিম্নোক্ত ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। যেমন-বিভিন্ন ধরনের মরুভূমি, গৌর, ইয়ার্ডাঙ্গ, ইনসেলবার্জ, জুগেন, ভেন্টিফ্যাক্টস, শিলায়িত সমভূমি ও অগভীর হ্রদ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : ৫.১৭

১. শূন্যস্থানপূরন করুন

১.১. বহু গৌর বা প্রায় শুষ্কময় অঞ্চলে এরূপ বহু গৌর গঠিত হলে অনেক সময় এদেরকে .... বলে।

১.২. প্রবল বায়ু প্রবাহ .... অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বায়ু ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ৫টি ভূমিরূপের নাম লিখুন।

২. টিকা লিখুন :

২.১. গৌর, ২.২. ইয়াডাগ, ২.৩. ইনসেলবার্গ, ২.৪.জুগেল, ২.৫. ভেন্টি ফ্যাক্টেস

৩. বায়ুর বহনকার্যের প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বিবরণ দিন।

পাঠ-৫.১৮

বায়ু: বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
Wind and its Depositional Landforms

এই পাঠ থেকে আপনি-

- বায়ুর দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হতে পারবেন;
- মরু অঞ্চলের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বিবরণ দিতে পারবেন।

বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূ-প্রকৃতি (Depositional Features of Wind) :
ভূ-পৃষ্ঠের বালুকণা, ধূলিকণা, আগ্নেয়ভস্ম প্রভৃতি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নীত হবার সময় বায়ুর বেগ হ্রাস পেলে বা সম্মুখে কোনো বাধা পড়লে সেগুলো ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে। এরূপে বায়ুর দ্বারা নিম্নভূমি উচ্চ হয়। আবার উর্বর ভূমি মরু ভূমিতে পরিণত হয়। বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিচে বর্ণিত হলো।

বালিয়াড়ি (Sand Dunes) : বালিযাড়ি গঠন বায়ুর অবক্ষেপনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বায়ু প্রবাহ দ্বারা বালুকারাশি এক স্থান হতে বাহিত হয়ে। অন্যস্থানে সঞ্চিত করে উচ্চ ও দীর্ঘ বালির স্তুপ গঠন করে। একে বালির পাহাড় বা বালিয়াড়ি বলে (চিত্র-৫.১৮.১)। এরূপ বালিয়াড়ি মরু অঞ্চল ব্যতীত সমুদ্রোপকূলেও দেখা যায়। তবে সমুদ্রোপকূলের বালিয়াড়ি সাধারণত ছোট এবং গাছপালার সাহায্যে ভূমির সহিত আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীরূপে অবস্থান করে।

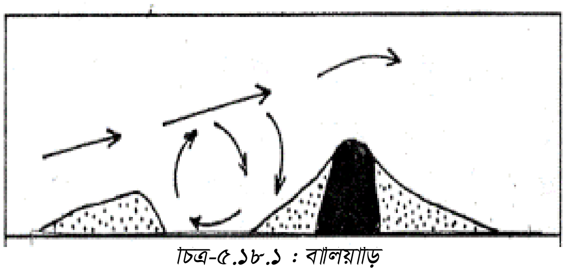

চিত্র-৫.১৮.১ : বালিয়াড়

বালুকাপূর্ণ বাতাস তার গতিপথে প্রস্তর খন্ড বা অন্য কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বালুকারাশি সঞ্চিত হয়ে বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। প্রস্তর খন্ডের যে দিক থেকে বালুকাপূর্ণ বাতাস আসে, তার বিপরীত (Leeside) বালুকা রাশি সরু লেজের আকারে সঞ্চিত হয়। একে পুচ্ছ বা লেজ বালিয়াড়ি (Tail Dune) বলে। প্রস্তর খন্ডের যেদিক থেকে বালুকাপূর্ণ বাতাস আসে, সেই দিকেও কিছু বালু সঞ্চিত হয়। তাকে মস্তক বা সংলগ্ন বালিয়াড়ি (Head or Attached Bune) বলে। সংলগ্ন বালিয়াড়ির কিছু আগেই ঘূর্ণি বাতাসের জন্য কিছু বালি সঞ্চিত হয়ে পার্শ্বস্থ যে বালিয়াড়ির সৃষ্টি করে তাকে অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি (Advanced Dune) বলা হয়। সর্বশেষ প্রস্তর খন্ডের কিছু দূরে উভয় পার্শ্বেও বালু সঞ্চিত হয়ে পার্শ্বস্থ বালিয়াড়ি (Lateral and Wake Dune) গঠন করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ বিভিন্ন বালিয়াড়ি কিন্তু সব সময়ে এবং সর্বত্র গঠিত হয় না।

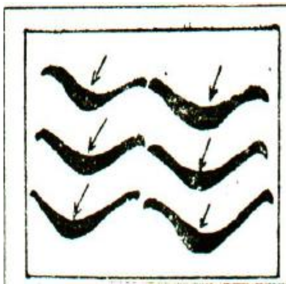

চিত্র-৫.১৮.২ : আড়াআড়ি বালিয়াড়ি

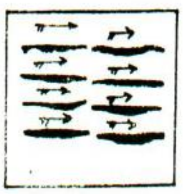

চিত্র-৫.১৮.৩ : অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি

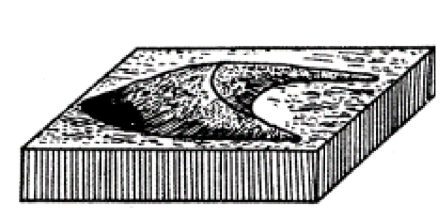
চিত্র-৫.১৮.৪ : বার্খান

ব্যাগনল্ড (Bagnold) নামে বিজ্ঞানী বালিয়াড়িকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ হলো-(১) অনুপ্রস্থ বালিয়াড়ি (Transverse Dunes) -এটি বায়ুর গতির আড়াআড়িভাবে গঠিত বালিয়াড়ি; (চিত্র-৫.১৮.২) এবং (২) অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি (Longitudinal Dunes) -(চিত্র-৫.১৮.৩) এরূপ বালিয়াড়ি বায়ুর গতির সঙ্গে সমান্তরালে গঠিত হয়।

বার্খান (Barkhans) : বায়ুর গতির আড়াআড়িভাবে অর্ধচন্দ্রকার বালিয়াড়িগুলোকে (Crescentic Dunes) বার্খান (Barkhan বা Barkhan) বলে (চিত্র-৫.১৮.৪)। তুর্কিস্তান মরু অঞ্চলে গঠিত এ ধরনের বালিয়াড়ি হতে এর নাম হয়েছে। বার্খান বিভিন্ন উচ্চতার হয়ে থাকে। কখনও কখনও এর উচ্চতার ১০০ ফুটের (৩৩ মি.) অধিক হয়ে থাকে। বার্খানের সম্মুখভাগ উত্তল (Convex) ও পিছনের অংশ অবতল (Concave) হয় এবং দুই কিনারায় অর্ধ-চন্দ্রকারে দুটি শিং (Horn)-এর মতো শিরা অবস্থান করে। এ সকল বালিয়াড়ি বায়ুর গতির দিকের প্রতিবাত ঢাল (Wind Ward Side) ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়, কিন্তু বিপরীত দিকের স্খালিত অংশ (Slip Face) বা অনুবাত ঢালটি (Leeward Slope) খাড়াই হয়। বালিয়াড়ি এক স্থানে স্থায়ী হয় না। বায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক স্থানের বালিয়াড়ি ভেঙ্গে পুনরায় অন্য স্থানে গড়ে ওঠে। তবে অনেক সময় যে সকল স্থানে ভূ-গর্ভের পানি ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হয় অথবা ছোট ছোট গাছপালা দেখা দেয় সেই সকল স্থানে বালিয়াড়ির কিনারা দুইটি স্থায়ী বালিয়াড়ি (Fixation of Dunes) সৃষ্টি হয়।

বার্খান বা তির্যক বালিয়াড়ির গঠনের সূত্রপাত কিরূপে হয় তা নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে এর গঠনের জন্য বাতাসের খুব বৃহদাকার কোনো বাঁধার প্রয়োজন হয় না। এমনকি প্রায় সমতল ভূমিতেও এটি গঠিত হতে দেখা যায়।

বার্খান বিচ্ছিন্ন ভাবে (Isolated) অবস্থান না করে সাধারণতঃ অনেকগুলো একত্রে অবস্থান করে থাকে। এইভাবে অনেকগুলো বার্খানের অবস্থানকে বালিয়াড়ির শৃঙ্খলা বা কলোনী (Dune Chains বা Dune Complex) বলা হয়।

অনুদৈর্ঘ্য বা বালিয়াড়ি (Longitudinal Dune) : মরু অঞ্চলে কখনো কখনো বা সিফ বালিয়াড়ি বহুদূর বিস্তৃত হয়ে অবস্থান করে (চিত্র-৫.১৮.৩)। এদেরকে সিফ বা অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বলে। মিশরে এইরূপ 'সিফ' বালিয়াড়ি ১০০ মি. এবং ইরানে ২১০ মি. পর্যন্ত উচ্চ হয়ে থাকে। ব্যাগানল্ডের মতে সিফের প্রস্থ বা বিস্তার (Width) উচ্চতার প্রায় ৫ গুণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো অঞ্চলে ৩০০ কি.মি. দীর্ঘ সিফ বালিয়াড়িও দেখতে থেকে বাতাস প্রবাহিত না হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। সিফ বালিয়াড়ি তখনই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, যখন বালিয়াড়ির সমান্তরালে বাতাস প্রবাহিত হয়। তাঁর মতে বার্খান বা তির্যক বালিয়াড়ির রূপান্তরেই সিফ বারিয়াগি গঠিত হয়।

অনুপ্রস্থ বালিয়াড়ি (Transverse Dunes) : অনেক সময় মরুভূমিতে বায়ুর গতির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ঢেউয়ের মতো যে সকল উন্নত ভূমি গঠিত হয় তাদেরকে আড়াআড়ি বালিয়াড়ি বলে। এরা বায়ুর গতির সাথে সমকোণে থাকে বলে অনেক সময় অর্ধচন্দ্রকারের মতো দেখায় (চিত্র ৫.১৮.২)। নক্ষত্র বালিয়াড়ি (Star Dune) বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক থেকে বায়ু প্রবাহের ফলে বহু স্খলন তলযুক্ত বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। এদের পার্শ্বচলন থেকে উর্ধ্বদিকে বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে।

প্যারাবলিক বা অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি (Parabolic Dune) : যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী সেখানে উদ্ভিদ সংস্থান কিছু বালিয়াড়িতে সুস্থিত করে। এইসব ক্ষেত্রে বায়ুর কার্যের ফলে বালিয়াড়ি পরিমার্জন ঘটে। উদ্ভিদ দ্বারা সুস্থিত বালিয়াড়ির দুই অংশের অন্তবর্তী অংশে উদ্ভিদ

মুক্ত অংশ থাকে। সঞ্চালন কার্যের ফলে ঐ অংশের বালির খনন চলে ও সৃষ্ট গর্তের চতুর্দিকে এ বালি সঞ্চিত হয়ে প্যারাবলিক বালিয়াড়ির সৃষ্টি করে। এরূপ বালিয়াড়ির খাড়াতল প্রতিবাত দিকে ও পশ্চাৎ মৃদু ঢাল অনুবাত দিকে অবস্থান করে। এই অবস্থা বার্খানের বিপরীত।

তিমিপৃষ্ঠ বালিয়াড়ি (Whale Back Dune) : তিমিপৃষ্ঠে সমতল মস্তক বিশেষ শৈলশিলা অনুরূপ। এরা বাতাসের দিকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ির মতো এদের স্খলন তল থাকে না। আয়তনেও এরা অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি থেকে অনেক বড় হয়। তিমি পৃষ্ঠ বালিয়াড়ির দৈর্ঘ্য ১৫০ কি.মি., প্রস্থ ৩ কি. মি. ও উচ্চতায় ৪৫ কি. পর্যন্ত হতে পারে। বাগনল্ডের মতে পুরাতন সারিবদ্ধ বালিয়াড়ির অবশিষ্টাংশ থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র তরঙ্গ (Small Ripples) : এটা অনেকটা তিমি পৃষ্ঠের মতো। তবে এরা দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত কম ও তিমি পৃষ্ঠের মতো সুনির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট হয় না।

বালি আস্তরণ (Sand Sheet) : বালি আস্তরণের ওপরিভাগ ভীষণভাবে সমতল থাকে। অবশ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গ এতে বর্তমান থাকে।

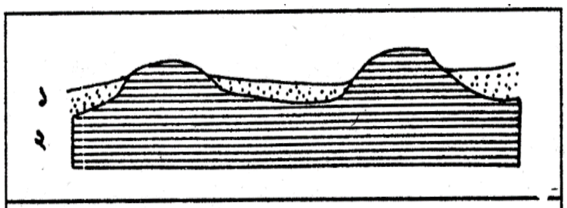

চিত্র-৫.১৮.৫ : লোয়েস মৃত্তিকা : ১. লোয়েস সঞ্চয়, ২. পুরাতন শিলা

লোয়েস (Loess) : বায়ুবাহিত (Wind Blown) অতি সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ দূরদেশে সঞ্চিত হলে তাকে লোয়েস বলে (চিত্র-৫.১৮.৫)। এটি সাধারণত: হলুদ বর্ণের বায়ুবাহিত অতি সূক্ষ্ম নরম প্রবেশ্য চূর্ণকময় (Calcarious) পলি (Silt) দ্বারা গঠিত। এগুলো কোন বিশিষ্ট (Angular) কোয়ার্টজ, ফেলস্পার ক্যালসাইট, ডলোমাইট এবং অন্যান্য খনিজের কণা একত্রে আটকিয়ে থাকে। বিশিষ্ট জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী রিকথোপেন (Richthofen) সর্ব প্রথম হলুদ বর্ণের এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ উত্তর-পশ্চিম চীনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবৃত করে রাখতে দেখেন। এ সূক্ষ্ম পদার্থ সুদূর গোবি মরুভূমি থেকে বহুদিন ধরে বায়ু বাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম চীনের ৫৪৫ হাজার বর্গ কি.মি. অঞ্চল আবৃত করে রেখেছে। এ বিস্তৃত লোয়েস মালভূমির কোনো কোনো অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,৫৫৫ মি. পর্যন্ত উঁচু। ফ্রান্স-এর অ্যালস্যাক (Alsace) অঞ্চলের একটি গ্রামে প্রায় এ ধরনের সূক্ষ্ম পদার্থের সঞ্চয় দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই গ্রামের নাম থেকেই 'লোয়েস' নামে উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ :

বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বালিয়াড়ি। মরু অঞ্চলে সাধারণত অনুদৈর্ঘ্য ও তির্যক বালিয়াড়ি গঠিত হয়। এখানে বহু ধরনের বালিয়াড়ি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া লোয়েস মরু অঞ্চলের পরিচিত দৃশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. শূন্যস্থান পূরন করুন :

১.১. বালিয়াড়ি গঠন বায়ুর………………. সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

১.২. বায়ুর গতির আড়াআড়িভাবে অর্ধচন্দ্রকার বালিয়াড়িগুলো ………….।

১.৩. অনেকগুলো. ………………..অবস্থানকে বালিয়াড়ির শৃঙ্খলা বা কলোনী বলা হয়।

১.৪. ব্যাগনল্ডের মতে সিফের প্রস্থ বা বিস্তার (Width) উচ্চতার প্রায় …. গুণ হয়ে থাকে।

১.৫. বাগনল্ডের মতে পুরাতন সারিবদ্ধ বালিয়াড়ির অবশিষ্টাংশ থেকে ……. বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়েছে।

১.৬. বায়ুবাহিত (Wind Blown) অতি সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ দূরদেশে সঞ্চিত হলে তাকে বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বালু, ধূলিকণা ইত্যাদি কেন সঞ্চিত হয়?

২. বালিয়াড়ি কি?

৩. বালিয়াড়ি প্রধানত কত প্রকারের?

৪. বার্খান কাকে বলে?

৫. সিফ বা অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বলতে কি বোঝেন?

৬. বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ির নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহের বিবরণ দিন।

২. বায়ুর কার্যের অনুকূল পরিবেশ ও অঞ্চলের বিবরণ দিন।

৩. মরু অঞ্চলে পানির দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ সমূহের বর্ণনা দিন।

৪. টিকা লিখুন :
(ক) লোয়েস, (খ) ইয়াডাঙ্গ, (৩) বালিয়াড়ি, (ঘ) গৌর, (ঙ) বার্খান
(:) মন্দভূমি, (ট) ওয়াদি।

৫। উপরের ৪ নং প্রশ্নের কোনটি ক্ষয়জাত এবং কোনগুলো সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ তা চিহ্নিত করুন।

পাঠ-৫.১৯

মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ
Landforms of Desert

এই পাঠ থেকে আপনি-

- মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হতে পারবেন;
- মরুভূমি অঞ্চলে পানি দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবরণ দিতে পারবেন।

মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ : মরুভূমির ভূ-প্রকৃতি বলে কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন উভয় দিক থেকেই কোনো দুই মরুভূমি এক প্রকারের নয়। মরুভূমির খুব সামান্য অংশই বালিয়াড়ি অধিকার করে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক মরুভূমিতেই বালিয়াড়ি স্থানীয় ভাবে বৈশিষ্ট্যমূলক ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।

ব্ল্যাকওয়েল্ডার (Blackwelder) মতে সমভূমি হলো মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ। মরুভূমি অঞ্চলে পাঁচ প্রকারের সমভূমি সনাক্ত করা যায়। যথাঃ (১) প্লাবন সমভূমি, (২) ভূ-গঠনকারী সমভূমি, (৩) বাজাদা, (৪) প্লায়া, ও (৫) পেডিমেন্ট।

(১) প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) : মরুভূমি অঞ্চলে কোনো স্থায়ী নদী সৃষ্টি হতে পারে না, কিন্তু বৃষ্টি বহুল স্থানে উৎপন্ন কিছু নদী পানি সংগ্রহ করে মরুভূমি অতিক্রম করতে পারে বা সাম্প্রতিক কালে করতো। যেমন: বর্তমানে আফ্রিকার নীল নদ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমভূমির সৃষ্টি করে। এইরূপ সমভূমির পরিমাণ মরুভূমিতে অতি নগণ্য।

(২) ভূ-গঠনকারী সমভূমি (Structural Plain) : অনেক সময় ভূ-আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট অবনত ভূমিতে পলি সঞ্চিত হয়ে বা অনুভূমিক স্তরের ওপর ভূ-গঠনকারী সমভূমির সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার মোজেভ বা মোহেভ মরুভূমি প্রথম প্রকারের ও কলরাডো মালভূমি দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ।

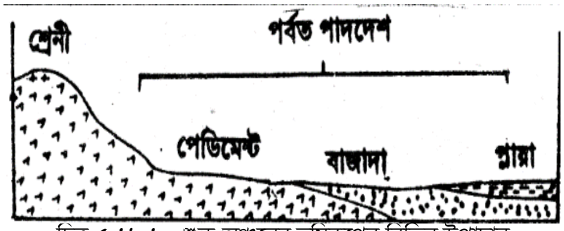

চিত্র-৫.১৯.১ : শুষ্ক অঞ্চলের ভূমিরূপের বিভিন্ন উপাদান

বাজাদা, প্লায়া, ও পেডিমেন্ট : বাজাদা, প্লায়া ও পেডিমেন্ট দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমি অঞ্চলে চ্যুতির ফলে অনেকগুলো পর্বত বেষ্টিত পর্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এদেরকে বোল্‌সন (Bolson) বলে। এতে কেন্দ্রাভিমুখী পানি নির্গমন প্রণালী সৃষ্টি হয়েছে এবং কেন্দ্রস্থল একটি সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়। এর ওপর বর্তমান বা অতীত হ্রদের নিদর্শন পাওয়া যায়, এদেরকে প্লায়া বলে। কদাচিৎ যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় সেই সময় ছাড়া অন্য সময় এরা শুষ্ক থাকে। এই ক্ষণস্থায়ী হ্রদের পানি থেকে অধঃক্ষিপ্ত অ্যালকালির আবরণের জন্য এদের উপরিভাগকে শুষ্ক সময়ে চকচকে দেখায়। এগুলোকে অ্যালকালি ফ্ল্যাট (Alkali Flats) বলে। যদি এইরূপ স্থানে লবনের আধিক্য ঘটে তাহলে একে স্যালিনা (Salina) বলে। মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতেও এরকম অনেক ভূমিরূপ লক্ষ্য করা যায়।

মরুভূমি অঞ্চলের পর্বতগুলোকে বেষ্টন করে এক পর্বত পাদদেশীয় মৃদু ঢালযুক্ত সমভূমির সৃষ্টি হয়। এরা বিস্তৃত হয়ে প্লায়া সমভূমিতে মিশে যায়। পর্বত পাদদেশীয় এ ঢালকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। নিম্নাংশের সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট বাজাদা এর উর্ধ্বাংশে নগ্নভূমি শিলা বা এর ওপর সংকীর্ণ পলির আবরণ সমন্বিত পেডিমেন্ট। পেডিমেন্ট ও বাজাদার ঢাল বেশ মৃদু থাকে

সাধারণত ১°/২ থেকে ৭° এর মধ্যে (চিত্র-৫.১৯.১)। পর্বত থেকে বহির্গত নদীগুলো বাজাদা পাদদেশীয় ঢালে পলি সঞ্চিত করে বাজাদা সমভূমির সৃষ্টি করে। বাজাদার সঞ্চিত পদার্থ সাধারণত গ্রাভেল জাতীয় শিলাখন্ড দ্বারা গঠিত হয়। তবে কখনো কখনো কাদার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় শিলাখন্ডও লক্ষ্য করা যায়।

মরুভূমি অঞ্চলে পানি দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ (Land Forms Produced by Water in Desert): মরুভূমি অঞ্চলে ভূমিরূপ গঠনে যদিও বায়ু প্রধান ভূমিকা পালন করে তবুও পানি এ কার্যে কিছু কিছু সহায়তা করে থাকে। প্রকৃত উষ্ণ মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। কিন্তু মরুপ্রায় অঞ্চলে যে সকল স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫-৩৮ সে.মি. সে সকল স্থানে পানি ধারার কার্য দেখতে পাওয়া যায়। এর সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম হলেও যখনই বৃষ্টিপাত হয়, তখন তা প্রবলভাবে হয়। এ বৃষ্টিপাত খুব কম সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। এ সকল স্রোত ধারার সঙ্গে মরুভূমির মধ্যস্থিত শিলাচূর্ণ, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাঁদা ইত্যাদি বের হতে থাকে। ক্রমশ এসব ক্ষয়জাত পদার্থসমূহ বৃদ্ধি পেয়ে একটি কর্দম ধারায় (Mud Flow) পরিণত হয়। অবশেষে কর্দম ধারার প্রবাহ বন্ধ হয়ে বিস্তৃত প্রবাহে (Sheet Flow) পরিণত হয়। এভাবে মরুভূমির মাঝে জলস্রোতের মাধ্যমে যে নদী খাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ওয়াদি (Wadi) বলা হয়। ওয়াদিগুলো অধিকাংশ সময়ই মরুভূমি অঞ্চলে শুষ্ক নদী উপত্যকা হিসেবে অবস্থান করে। ওয়াদি ছাড়া মরু অঞ্চলে জলস্রোতের দ্বারা নিম্নলিখিত ভূমিরূপগুলোও সৃষ্টি হয়।

পেডিমেন্ট (Pediment) : মরু অঞ্চলে বায়ু প্রবাহ ও জলধারা মিলিতভাবে পর্বতের পাদদেশে যে সমতল ভূমি গঠন করে তাই পেডিমেন্ট বা পাদদেশীয় সমভূমি (চিত্র-৫.১৯.২)। এখানে পেডি (Pedi) অর্থ পাদদেশ এবং মন্ট (Montmant) অর্থ পর্বত। মরুভূমির মধ্যস্থিত পর্বতের পাদদেশে বায়ু প্রবাহের ক্ষয় ক্রিয়ার দরুন এক প্রকার প্রায় সমতল প্রস্তর ভূমির সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রায় সমতল ভূমির ওপরের অংশ বেশ ঢালু হলেও এর নিচের অংশ অনেকটা সমতল বলে সেখানে ছোট ছোট জলধারা বাহিত বালি, কাদা, নুড়ি, কাঁকর ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে সমভূমি গঠন করে। এরূপে বায়ুর ক্ষয়ক্রিয়া এবং জলধারার সঞ্চয় ক্রিয়ার মিলিত প্রভাবে মরুভূমির মধ্যস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে পেডিমেন্ট সমতল ভূমি গঠিত হয়। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পেডিমেন্ট দৃষ্ট হয়।

বাজাদা (Bajada) : পাদদেশীয় সমভূমির নিচের অবনমিত অংশে জলধারা বাহিত দীর্ঘদিন ধরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠন করে তাকে বাজাদা বলে। এটি কেবল মরু অঞ্চলে জলধারা সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলেই গঠিত হয়ে থাকে। জলধারা বা নদীবাহিত পলি জমা হয়ে পাখার ন্যায় সৃষ্ট কতকগুলো পলল ভূমি একত্র হয়ে প্রকৃত বাজাদা গঠিত হয়। বাজাদার ওপরিভাগ অসমান হয়ে থাকে। অপরদিকে পেডিমেন্টের উপরিভাগ প্রায় সমতল বা সমান্য অবতল (Concave) হয়।

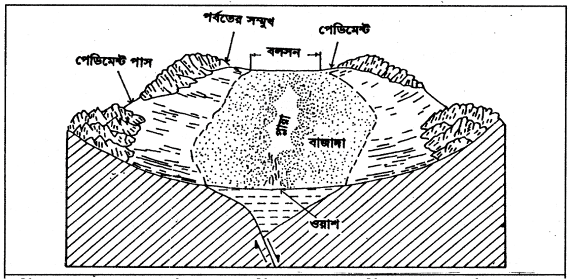

চিত্র-৫.১৯.২ : পার্বত্য মরুভূমিতে ভূ-প্রাকৃতিক রূপ: পর্বত সম্মুখ, পেডিমেন্ট, বাজাদা, বলসন ও প্লেরা

প্লায়া (Playa) : মরু অঞ্চলে মাঝে মাঝে হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে। এরূপ হঠাৎ বৃষ্টিপাতের দরুন মরুভূমির মধ্যস্থিত ক্ষয়জাত দ্রব্যসমূহ জলধারার সাথে বাহিত হয়ে কর্দম প্রবাহরূপে পাদদেশীয় সমভূমি ও বাজাদা অতিক্রম করে নিচু ভূমিতে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে। ঐ পানি মরু অঞ্চলের মধ্যস্থিত নিচু ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে ছোট ছোট লবন হ্রদের সৃষ্টি করে। মরু অঞ্চলের মধ্যস্থিত এ জাতীয় ছোট ছোট লোনা পানির হ্রদকে প্লায়া

বলে। আফ্রিকায় এ জাতীয় হ্রদকে শটস (Shotts) এবং মেক্সিকো ও অ্যারিজোনাতে বোলসন (Bolson) বলা হয়ে থাকে।

মন্দ ভূমি (Bad Land) : শুষ্ক অঞ্চলের মালভূমিতে অসংখ্য দাগাকাটা নদী উপত্যকার ন্যায় ভূমি দৃষ্ট হয়। এদের কতকগুলো আবার শৈল শ্রেণীর মধ্য হতে উদগত পরস্পর আবদ্ধ পর্বত রূপে অবস্থান করে। এরূপ খন্ডে খন্ডে কাটা ভূপৃষ্ঠকে মন্দ ভূমি বলা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, কলোরাডো, নিউমেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ মন্দ ভূমি বদ ভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

পাঠসংক্ষেপ :

মরুভূমির ভূ-প্রকৃতি বলে কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন উভয় দিক থেকেই কোনো দুই মরুভূমি এক প্রকারের নয়। মরুভূমির খুব সামান্য অংশই বালিয়াড়ি অধিকার করে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক মরুভূমিতেই বালিয়াড়ি স্থানীয় ভাবে বৈশিষ্ট্যমূলক ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। ব্ল্যাকওয়েল্ডারের ((Blackwelder) মতে সমভূমি হলো মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ। মরুভূমি অঞ্চলে পাঁচ প্রকারের সমভূমি সনাক্ত করা যায়। যথাঃ (১) প্লাবন সমভূমি, (২) ভূ-গঠনকারী সমভূমি, (৩) বাজাদা, (৪) প্লায়া, ও (৫) পেডিমেন্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১৯

১. শূন্যস্থানপূরণ করুন :

১.১. মরুভূমি অঞ্চলে .... প্রকারের সমভূমি সনাক্ত করা যায়।

১.২. পেডিমেন্ট ও বাজাদার ঢাল বেশ মৃদু থাকে সাধারণত ১°/২ থেকে ....এর মধ্যে।

১.৩. মরুভূমির মাঝে জলস্রোতের মাধ্যমে যে নদী খাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ..... বলা হয়।

১.৪. মরু অঞ্চলের মধ্যস্থিত এ জাতীয় ছোট ছোট লোনা পানির হ্রদকে .... বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. প্লাবন সমভূমি, (খ). ভূ-গঠনকারী সমভূমি, (গ) বাজাদা, (ঘ) পেডিমেন্ট

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মরুভূমি প্রধান ভূমিরূপসমূহের বর্ণনা দিন।

২. মরুভূমি অঞ্চলে পানি দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ-এর বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৫ (অতিরিক্ত অনুশীলনের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১. নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথকে .....পর্যায়ে ভাগ করা যায়।
২. নদীর পানির পরিমাণ ও পানির গতিবেগকে একত্রে নদীর ....বলে।
৩. নদীর গতিপথে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন কার্যের জন্য ...প্রয়োজন।
৪. .... ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে নদী তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।
৫. নদীর পার্শ্বক্ষয় নদীর .... বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
৬. নদীর মোট শক্তির শতকরা .... থেকে ....ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে থাকে।
৭. চুনাপাথর অঞ্চলে নদী ....প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভার বহন করে থাকে।
৮. নদীগর্ভে কঠিন শিলায় গঠিত হলে নদীর ক্ষয়কার্য ....হয় এবং কোমল শিলায় গঠিত হলে নদীর ক্ষয়কার্য ....হয়।
৯. নদীবাহিত পদার্থগুলো অত্যন্ত কঠিন হলে নদীর ক্ষয়কার্য .... হয়।
১০. পার্বত্য অবস্থায় নদীর ....কার্যই সর্বাধিক।
১১. পার্বত্য অবস্থায় নদীতে .... আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয়
১২. নদীর মধ্যগতিতে .... আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয় কারণ এখানে নদীতে ...... ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশী হয়।
১৩. গিরিখাত, ক্যানিয়ান, জলপ্রপাত ইত্যাদি নদীর ....গতিতে গঠিত হয়।
১৪. নদীর ....গতিতে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়।
১৫. সমুদ্র পৃষ্ঠের ....উঃ ও দঃ অক্ষাংশের মধ্যে কদাচিৎ হিমবাহের সৃষ্টি হয়।
১৬. চলন্ত বরফের স্তুপকে ....বলে।
১৭. ....ছাড়া স্থায়ী বরফ ক্ষেত্র প্রায় সব মহাদেশেই পাওয়া যায়।
১৮. সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তুপকে ..... বলে।
১৯. হিমশৈল ....অক্ষাংশে পৌঁছলে তা গলতে আরম্ভ করে।
২০. বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ....শতাংশ স্থান জুড়ে হিমবাহ বিস্তৃত।
২১. পৃথিবীর শতকরা ৯৫ ভাগ হিমবাহ অবস্থান করছে ....ও .... ।
২২. পৃথিবীর লবনহীন পানির শতকরা ...... ভাগ আন্টার্কটিকা হিমবাহে আটকা পড়ে আছে।
২৩. .... বরফে রূপান্তরিত হয়ে হিমবাহের সৃষ্টি করে।
২৪. ঘনত্ব অনুযায়ী তুষারের পরে ফার্ণ ও তার পরে ....ঘনত্ব।
২৫. তুষারের ....নিম্নস্থানের কিছু পরিমাণ বরফ গলে থাকে।
২৬. পৃথিবীর ....শক্তির প্রভাবেও তুষার স্তুপের নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
২৭. ....অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে হিমবাহের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।
২৮. হিমবাহের প্রবাহ মধ্যভাগে অধিক হওয়ায় এর সম্মুখ ভাগ অনেকটা ....ন্যায় দেখায়, একে .... বলে।
২৯. আন্টার্কটিকা মহাদেশীয় হিমবাহ গ্রীণল্যান্ড মহাদেশীয় হিমবাহ অপেক্ষা প্রায় ....গুণের অধিক এলাকায় বিস্তৃত।
৩০. আন্টার্কটিকা প্রায় ....বর্গ কি.মি. স্থান জুড়ে অবস্থান করছে।
৩১. গ্রীনল্যান্ড প্রায় ....বর্গ কি.মি. স্থান জুড়ে অবস্থান করছে।
৩২. পার্বত্য হিমবাহ সর্বপ্রথম আল্পস পর্বতে দৃষ্ট হয়েছিল বলে একে ....হিমবাহ বলা হয়।
৩৩. পৃথিবীর প্রায় শতকরা ....ভাগ জুড়ে মরু অঞ্চল অবস্থিত।
৩৪. শীতল মরু অঞ্চল ....ও ....অঞ্চলে অবস্থান করে।
৩৫. বায়ুর কার্য সবচেয়ে বেশী ....দেখতে পাওয়া যায়।
৩৬. ক্রান্তীয় মরু অঞ্চল নিরক্ষ রেখা থেকে ....ও ....উঃ ও দঃ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলোর পশ্চিম দিকে অবস্থান করে।
৩৭. মধ্য অক্ষাংশীয় মরুভূমি মহাদেশগুলোর ....ভাগে অবস্থিত।

৩৮. কালাহারি মরুভূমি ………………আফ্রিকায় অবস্থিত।
৩৯. যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ ইঞ্চিরও কম সেই অঞ্চলকে ………অঞ্চল বলে।
৪০. যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০ থেকে ২০ ইঞ্চির মধ্যে থাকে তাকে……..অঞ্চল বলে।
৪১. শিলায়িত মরুভূমি……………নামেও পরিচিত।
৪২. ব্যাঙের ছাতার মতো আকৃতি বিশিষ্ট্য শিলাখন্ডকে ………বলা হয়।
৪৩. ইনসেলবার্গ …………রূপে অবস্থান করে।
৪৪. মরু অঞ্চলে কোনাকৃতি শিলাখন্ডগুলোকে ……….. নামে পরিচিত।
৪৫. …………বিচূর্ণীভবনে প্রাপ্ত পদার্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় অবসারণের ফলে সঞ্চালন গর্তের সৃষ্টি হয়।
৪৬. মরুভূমির খুব সামান্য অংশই ……….অধিকার করে থাকে।
৪৭. ………… মতে সমভূমি হলো মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ।
৪৮. মরুভূমি অঞ্চলে ……………প্রকারের সমভূমি সনাক্ত করা যায়।
৪৯. মরুভূমি অঞ্চলে কোনো ………নদী সৃষ্টি হতে পারে না।
৫০. ………………ও ……… ঢাল বেশ মৃদু থাকে।
৫১. মরুভূমির মাঝে জলস্রোতের মাধ্যমে যে নদী খাতের সৃষ্টি হয় তাকে ………বলে।

সঠিক উত্তরের পশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১. ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়?
(ক) ধীর পরিবর্তন (খ) আকস্মিক পরিবর্তনশীল
(গ) সাদা পরিবর্তনশীল (ঘ) মোটেই পরিবর্তনশীল নয়

২. (ক) জোয়ার-ভাটা (খ) অগ্ন্যৎপাত
(গ) সূর্যের আলো (ঘ) মাধ্যাকর্ষণ

৩. কোন ধরনের আলোড়নের ফলে হিমালয়, রকি, আন্দিজ ইত্যাদি পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে?
(ক) অনুভূমিক (খ) বাহ্যিক
(গ) উল্লম্ব (ঘ) অভ্যন্তরীণ

৪. কোন ধরনের আলোড়নের ফলে সমুদ্র বুকে বিশাল ভূ-ভাগ জেগে উঠে?
(ক) অনুভূমিক আলোড়ন (খ) বাহ্যিক শক্তি
(গ) উল্লম্ব আলোড়ন (ঘ) অভ্যন্তরীন আলোড়ন

৫. ব-দ্বীপ সৃষ্টির সাথে কোনটি সহায়ক নয়?
(ক) তলানি সঞ্চয় (খ) বাহ্যিক শক্তি
(গ) নদীর সঞ্চয় (ঘ) জোয়ার ভাটা

৬. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের সাথে কোনটি জড়িত নয়?
(ক) তুষার (খ) নদী
(গ) নদীর সঞ্চয় (ঘ) প্রাণী

৭. কোন শক্তিটি ক্ষয় সাধনে সর্বাধিক সক্রিয়?
(ক) নদী প্রবাহ (খ) বায়ু প্রবাহ
(গ) হিমবাহ (ঘ) জল-প্রপাত

৮. কোন বৈশিষ্ট্যটি অগ্ন্যৎপাতের সাথে জড়িত নয়?
(ক) দ্বীপ গঠন (খ) ভূ-কম্পন
(গ) ব-দ্বীপ গঠন (ঘ) ভূভাগ

৯. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের সঙ্গে কোন উপাদানটি সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট নয়?
(ক) অক্সিজেন (খ) জলীয় বাষ্প

(গ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড (ঘ) উদ্ভিদ

১০. বারখান সৃষ্টির সাথে কোন শক্তিটি জড়িত?

(ক) ভূমিকম্প (খ) বায়ু প্রবাহ

(গ) হিমবাহ (ঘ) নদী প্রবাহ

১১. 'ভি' আকৃতির উপত্যকা নদীর কোন গতিতে সৃষ্টি হয়?

(ক) নদীর মধ্যগতিতে (খ) নদীর প্রাথমিক গতিতে

(গ) নদীর শেষ গতিতে (ঘ) কোন গতিতেই নয়।

১২. নদী বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী সক্রিয় কোন জলবায়ু অঞ্চলে?

(ক) ক্রান্তীয় অঞ্চলে (খ) মেরু অঞ্চলে

(গ) মরু অঞ্চলে (ঘ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে

১৩. পাবর্ত্য অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ-পরিবহন/ক্ষয়সাধন/কোনটি নয়।

১৪. নদীর নিম্নগতিতে কোন জাতীয় ক্ষয় সবচেয়ে বেশী-
পার্শ্বক্ষয়/খাড়াভাবে ক্ষয়সাধন/পশ্চাৎমুখী ক্ষয়সাধন কোনটি নয়।

১৫. নদীর প্রাথমিক গতিতে কোন ভূ-প্রাকৃতিক রূপ গঠিত হয়-
প্লাবন সমভূমি/ব-দ্বীপ/অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ/গিরিখাত।

ইউনিট-৫ উত্তরমালা :

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

পাঠ ৫.১

১.১. খ, ১.২. খ, ১.৩. গ

২.১. পরিবর্তনকারী, উদ্ভব

২.২. তিনটি

২.৩. স্তুপ ক্ষয়

২.৪. সঞ্চয়

২.৫. সমস্থিতি

পাঠ-৫.২

১.১. নগ্নীভবনের; ১.২. কমায়; ১.৩. চার; ১.৪. চূর্ণবিচূর্ণ; ১.৫. অপসারণ

১.৫. তিন; ১.৭. চারটি; ১.৮. যান্ত্রিক; ১.৯. প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক; ১.১০. মরু;

১.১১ খনিজের; ১.১২. টান (Strain); ১.১৩. ১০; ১.১৪. মাধ্যাকর্ষণ;

১.১৫.বিচূর্ণীভবনের; ১.১৬. কৈশিক।

পাঠ-৫.৩

১.১. (খ); ১.২. (খ); ১.৩(খ)

২.১. খনিজের; ২.২. রাসায়নিক; ২.৩. হাইড্রেশান; ২.৪. হাইড্রোলিসিস; ২.৫. অক্সিডেশান

২.৫. কার্বনেশান; ২.৭. পানির

পাঠ-৫.৪

১.১. (ক); ১.২. (গ); ১.৩ (খ)

২.১. নিয়ামক; ২.২. গ্রানাইট; ২.৩. ক্যালসাইট; ২.৪. ক্ষয়; ২.৫. নিয়ামক

পাঠ-৫.৫

১.১. (খ); ১.২. (গ); ১.৩. (খ); ১.৪. (ক); ১.৫. (খ); ১.৬. (ঘ); ১.৭. (গ); ১.৮. (ঘ);
১.৯. (ঘ);

পাঠ-৫.৬

১.১. খাতে ১.২. ভৌগলিক ১.৩. ঢালু ১.৪. তিনটি ১.৫. সমভূমি

পাঠ-৫.৭

১.১. অবক্ষেপন, ১.২. গতিবেগের, ১.৩. অবঘর্ষ, ১.৪. ৯৭, ১.৫. ভাসমান অবস্থায়

পাঠ-৫.৮

১.১. ক্ষয়; ১.২. উৎস, ১.৩. কোমল, ১.৪. আবর্তের, ১.৫. অনিয়মতার, ১.৫. ক্ষয়চক্র,
১.৭. ভাসমান

পাঠ-৫.৯

১.১. ঢাল, ১.২. ক্ষয়কার্য, সঞ্চয়, ১.৩. উত্তল, অবতল; ১.৪. অশ্বখুরাকৃতি; ১.৫. কর্দমছিপি;
১.৬. বদ্বীপ।

পাঠ-৫.১০

১.১. বরফের; ১.২. অস্ট্রেলিয়া; ১.৩. $^{১}/_{৯}$১.৪, ১৫০; ১.৫. ১০, ১.৬. ৫৫ বা ২২

পাঠ-৫.১১

১.১. চার; ১.২. ৮; ১.৩. পাদদেশীয়; ১.৪. তাপমাত্রার, ১.৫. ক্ষয়; ১.৫. অধিক

পাঠ-৫.১২

১.১. এরিটি; ১.২. দ্রোণী-প্রান্ত; ১.৩. অনিয়মিত; ১.৪. দানবীর সিঁড়ি; ১.৫. ফিয়র্ড

পাঠ-৫.১৩

১.১. বাহিত; ১.২. ক্ষয়কার্যের; ১.৩. ভূমি; ১.৪. পার্শ্ব, ১.৫. মধ্য; ১.৫. প্রান্ত, ১.৭. রোজেন

পাঠ-৫.১৪

১.১. হিমবিধৌত; ১.২. এস্কার; ১.৩. কেম; ১.৪.আউটওয়াশ; ১.৫. প্লাইস্টোসিন, ১.৬. কেটলি-হোল

পাঠ-৫.১৫

১.১. $^{১}/_{৩}$; ১.২. বায়ু; ১.৩. $^{১}/_{৩}$ ও ৩০ ভাগ, ১.৪. সর্ববৃহৎ; ১.৫. ৪০; ১.৬. ১০; ১.৭. ৩০, ১.৮.শুষ্ক

পাঠ-৫.১৬

১.১. বাহিত; ১.২. শুষ্ক; ১.৩. ক্ষয়; ১.৪. গর্তের; ১.৫. ২১.৬ বাহিত; ১.৬. রাসায়নিক

পাঠ-৫.১৭

১.১. স্তম্ভমূল; ১.২ মরু

পাঠ-৫.১৮

১.১. অবক্ষেপনের; ১.২. বার্খান, ১.৪. ৫, ১.৫. তিমিপৃষ্ঠ, ১.৬. লোয়েস

পাঠ-৫.১৯

১.১. পাঁচ; ১.২. ৭০; ১.৩. ওয়াদি; ১.৪. প্লায়া

ইউনিট-৫ উত্তরমালা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন: (অতিরিক্ত অনুশীলনের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করুন;

১. তিন; ২. প্রবাহ (..................) ৩. শক্তির; ৪. পশ্চাৎমুখী; ৫. প্রশস্থতা; ৬. (৯৫, ৯৭); ৭. দ্রবণ; ৮. অধিক; ৯. বেশী; ১০. ক্ষয়; ১১. 'ঠ' ১২. "ট" ১৩. উর্ধ্ব/পার্বত্য; ১৪. মধ্য

১৫. ৩০০; ১৬. হিমবাহ; ১৭. অস্ট্রেলিয়া; ১৮. হৈমশৈল; ১৯. নিম্ন; ২০.১০; ২১. আন্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড; ২২. ৭৫; ২৩. তুষার; ২৪, বরফের; ২৫. চাপে; ২৬. আকর্ষণ; ২৭. শীতকাল; ২৮; জিহ্বার, স্নাউট; ২৯. ৮; ৩০. ১ কোট ৩০ লক্ষ; ৩১, ১৫ লক্ষ; ৩২.
আলপাইন ৩৩. ৩০০; ৩৪. মেরু, মেরুবৃত্ত; ৩৫. মেরু অঞ্চলে; ৩৬. ২০, ৩০°; ৩৭. অভ্যন্তর; ৩৮দক্ষিণ-পশ্চিম; ৩৯. শুষ্ক; ৪০. শুষ্ক প্রায়; ৪১. হামাদা; ৪২. গৌর; ৪৩. ক্ষয়জাত পর্বত; ৪৪. ভেন্টিফ্যাক্টস; ৪৫. রাসায়নিক; ৪৬. বালিয়াড়ি; ৪৭. ব্ল্যাক ওয়েন্ডারের; ৪৮. পাঁচ; ৪৯. স্থায়ী; ৫০. পেডেমেন্ট, বাজাদার; ৫১. ওয়াদি।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (4) চিহ্ন দিন:

১. (ক); ২. (খ); ৩. (ক); ৪. (ক); ৫. (ঘ); ৬. (ঘ); ৭. (ক); ৮. (গ); ৯. (ঘ); ১০. (খ); ১১. (খ); ১২. (ক); ১৩. ক্ষয়সাধন; ১৪. পার্শ্ব ক্ষয়; ১৫. গিরিখাত

গ্রন্থপঞ্জি

1. Chorley, R.J., S.A. Schumm and D.F. Sugden, 1985. Geomorphology Methuen and Co. Ltd., London, New York.
2. Gilluly James and etl, 1968, Principles of Geology, W.H. Freeman and Company, San Francisco and London.
3. Science Foundation Cours 22, 1971. The Earth: It's Shape Internal Structure and Composition, The Open University Press, U.K.
4. Singh Savindra, 1998. Geomorphology, prayag Pustak, Allahabad, India.
5. Sparks, B.W.1960.Geomorphology, Longmans, U.K
6. Strahler A.H and Strahler,A.N, 1992. Modern Physical Geography, Singapore: John Wiley & Sons.
7. Tarbuck, E.J, and F.K. Lutgens, 1984. The Earth, An Introducation to Phsical Geology, Charles E. Merrill Publishing Com. A Bell & Howell Com. Columbus Ohio 43216.
8. Tarbuck, E.J, and F.K. Lutgens, 1984. The Earth Science, 7thed., McGrawhill, N.Y. College Pub. Com., N.Y
9. Thornbury, W.D 1968. Principles of Geomorphology, john wiley & sons.
10. Worcester, P.G 1965. A Text Book of Geomorphology, Von Nostrand.

১১. আলম, শা. ও রউফ কা, আ, ১৯৯৮। উচ্চ মাধ্যমিক প্রাকৃতিক ভূগোল, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. চৌধুরী মো, হো, ১৯৯৪। প্রাকৃতিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।

১৩. দাস, সু, চ, ১৯৯৮। আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৪. মুখোপাধ্যায় সু, ও দাস র, কু, ১৯৯৩। ভূমিরূপঃ উদ্ভব ও প্রকৃতি, ১ম খন্ড, ভূ-গাঠনিক ভূমিরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্কক পর্ষাৎ কলকাতা।

১৫. মুখোপাধ্যায় সু, ও দাস র, কু, ১৯৯৪। ভূমিরূপঃ উদ্ভব ও প্রকৃতি, ২য় খন্ড, পর্যায়ন ভূমিরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

১৬. বন্দোপাধ্যায় ত, কু, ১৯৮০। আধুনিক ভূ-পরিচয়, প্রথম খন্ড, কলকাতা।

ভূমিরূপবিদ্যার অবস্থার পেছনে বহু দার্শনিক ও ভূমিবিজ্ঞানী বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের ফল। প্রাচীন রোম ও গ্রীক যুগে দার্শনিক ভিত্তির ওপর জন্ম নিয়ে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূমিরূপ বিদ্যার বিকাশ ঘটে। পদ্ধতিগত সমীক্ষার মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর প্রথমও দ্বিতীয় দশকে ভূমিরূপ গঠনের চক্রাকার ধারণার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হয়। ১৯৫০ সালের পর ভূমিরূপবিদ্যা একটি বিজ্ঞান হিসেবে পূর্বের সমীক্ষা পদ্ধতি যেমন ডেভিসের ক্ষয়চক্রের বর্ণনামূলক পদ্ধতি পরিহার করে ভূমিরূপ বিদ্যায় সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রবর্তন, গতিশীল ভারসাম্য তত্ত্বের সংযোজনসহ পরিবেশ ভূমিরূপ বিদ্যার আবির্ভাব ঘটে।

মডেল একটি কাঠামোগত ধারণা যা কোনো প্রকৃত ঘটনা, কোনো প্রকল্প, কোনো তত্ত্ব বা কোনো আইনের প্রতিনিধিত্বকারী। অবস্থার পরিচিত ও বর্তমান বাস্তবতার ভিত্তিতে মডেলকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়: (১) বর্ণনামূলক মডেল (Descriptive Model) ও (২) মডেল (Narmative Model)। বর্ণনামূলক মডেলে গবেষণামূলক তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত কিন্ত রীতিবদ্ধ মডেলে কম পরিচিতি অবস্থার বর্ণনা স্থান পায়। ভূমিরূপ সমীক্ষা করতে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যেমন-(১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও (২) কার্মিক পদ্ধতি। বিরাট অঞ্চলের দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময়ের ভূমিরূপের বিবর্তন চিহ্নিত করার পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে। আর কার্মিক পদ্ধতি হলো বর্তমান চলমান প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অঞ্চলের ও স্বল্প সময়ের ভূমিরূপ সম্পর্কিত পদ্ধতি।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন